জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী

নিকোলাস কোপারনিকাস ★ জিওরদানো ব্রুনো ★ টাইকো ব্রাহী

জন কেপলার ★ গ্যালিলিও গ্যালিলি ★ আইসাক নিউটন

আলবার্ট আইনস্টাইন

লেখকঃ অধ্যাপক অমিতাভ সেন

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সপ্তরথী

নিকোলাস্ কোপারনিকাস্, জিওরদানো ব্রুনো, টাইকো ব্রাহী,
জন্ কেপলার্, গ্যালিলিও গ্যালিলি, আইসাক্ নিউটন,
আল্‌বার্ট আইনষ্টাইন্

লেখক ঃ
অধ্যাপক **অমিতাভ সেন**, এম্. এস্. সি

= প্রাপ্তিস্থান =
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য ঃ দুই টাকা মাত্র

পিতৃদেব শ্রীঅতুলরঞ্জন সেন মজুমদার মহাশয়ের
করকমলে সমর্পিত

‘অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়॥’

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া চল।
অন্ধকার হইতে আমাকে আলোয় লইয়া চল।
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া চল॥

—উপনিষদ্

প্রকাশক—
শ্রীঅমিতাভ সেন,
১৮।৩ ফার্ণ রোড্,
কলিকাতা-১৯

মুদ্রাকর—
শ্রীগোপেশ্বর বসাক,
বসাক ট্রেডিং কোং,
৮।৩, বরদা বসাক ষ্ট্রীট,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬

ভূমিকা

জ্যোতির্বিজ্ঞান পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্ঞানবিজ্ঞানগুলির অন্যতম। কবে কোন আদিম মানব তার জিজ্ঞাসু নয়নদু'টি আকাশের তমিস্রাঘন জ্যোতিষ্ক-খচিত রহস্যলোকের দিকে তুলে ধরেছিল তা আমরা জানিনা। অথচ আধুনিক পরমাণবিক যুগেও এই বিজ্ঞান তার মহিমাময় সিংহাসন থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয়নি।

পাশ্চাত্ত্য দেশের সাতজন মনীষির জীবন কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান গ্রন্থ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দেশকে ভাল করে জানতে হ'লে যেমন দেশের ইতিহাস জানা দরকার, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্যক ভাবে আয়ত্ত করতে হ'লেও তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করা দরকার। সকল বিজ্ঞানই সামাজিক মানুষের মননশক্তি ও ব্যবহারিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাস সমাজের, দেশের ও বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজকে, দেশকে ও বিশ্বকে ভাল করে বুঝতে হ'লেও এইজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন বিজ্ঞান-দর্শনের ইতিহাস পাঠই সম্পূর্ণ হয় না।

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞানের ইতিহাস অনাদৃত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী ও সংকীর্ণ হয়ে যায়, বিজ্ঞানের ইতিহাসের মত চমকপ্রদ, চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আনন্দস্বাদ থেকে তারা চিরবঞ্চিত থেকে যায়।

ছাত্র-ছাত্রী ও আগ্রহশীল সাধারণ পাঠকের চাহিদা মেটানর জন্য বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকাও তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল।

এই পুস্তিকারচনায় কয়েকখানি ইংরেজী বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অনভিজ্ঞতাবশতঃ ছাপার কাজে ও কোন কোন বিদেশী নামের বানানে যে ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল সেজন্য পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করি।

নিমতা,
১লা জানুয়ারী, ১৯৫৮

অমিতাভ সেন

[এক]

গোড়াকার কথা

আকাশের রহস্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে আকাশ পটের ঐ যে সব শরিক, ওরা কারা? কোথায় ওদের বাস? কি ওদের প্রকৃতি? কেনই বা ওদের এই 'অবিরাম, অকারণ' গতি?

আর কত না বৈচিত্র্য ওদের গতিতে! পরিচিত তারাগুলি তো পূব আকাশে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে নতুন তারা এসে তীব্র দ্যুতিতে আপন জন্ম ঘোষণা করে। আবার হয়ত কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। গ্রহদের গতি তো অতি জটিল ও আপাতদৃষ্টিতে অতি বিচিত্র। এই যে সকল জীবনের উৎস সূর্য্য, সেও রোজ এক জায়গায় উদিত হয় না, এক পথে আকাশপটে চলে না। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চাঁদের কতই না রূপবিবর্তন! মাঝে মাঝে আবার কালো ছায়া নেমে আসে সূর্য্য বা চন্দ্রের ওপরে। কখনও কখনও দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু এসে আকাশে আবির্ভূত হয়, আবার মিলিয়ে যায়। কখনও কখনও আবার 'তারা খসে পড়ে' আকাশ থেকে।

কোন অনাদি যুগে মানুষের মনে এসব প্রশ্ন জেগেছিল তা হয়ত লুকিয়ে আছে অনাবিষ্কৃত আদিম ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় যেখৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীনদেশের মনীষিরা এসব প্রশ্নের

জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আকাশপটের জ্যোতিষ্কদের আলোচনা যে বিজ্ঞানে হয় তারই নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই সব মনীষিদের তাই আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলি। সাতজন প্রতিভাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অবিস্মরণীয় জীবনসাধনার আলোচনা করাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য্যের বাৎসরিক পথের নক্সা তৈরী করেছিলেন। ধূমকেতু ও নবনক্ষত্র (নোভা) সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল। সূর্য্যের গায়ে যে কালো কলঙ্ক আছে তাও তাঁরা জানতেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণের সময় নিরূপণের গবেষণাও তাঁরা করতেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে খৃষ্টের জন্মের ২১৫৯ বছর আগে সূর্য্যগ্রহণের সময় সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে না পারার অপরাধে চীন দেশের রাজা হো ও হি নামের দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

চীনের পরে জ্যোতিষ্ক বিদ্যার চর্চায় নামেন চ্যালডীজ দেশের বিজ্ঞানীরা। তাঁরাই প্রথম ঘোষণা করেন যে ১৮ বছর ১১ দিন অন্তর সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই রকম আপেক্ষিক অবস্থানে ফিরে আসে।

বছরে ১২ মাস বা ৩৬০ দিনের প্রচলন করেছিলেন ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদেরা। সূর্য্য, চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহের (বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি) সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। আকাশপটের এই সাতটি ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক দেখেই বোধহয় সপ্তাহে সাতটি দিন করার ধারণা তাঁদের মাথায় আসে।

নীল নদের তীরেও প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চা হয়েছিল।

গ্রীস দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে মিলেটাসের থেলস্ সিদ্ধান্ত করেন যে চাঁদের

নিজস্ব কোন আলো নেই, চাঁদ সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোকেই আলোকিত। এই ধারণার সাহায্যে তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সহজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। গ্রীক জ্যামিতিবিদ্ পিথাগোরাস পৃথিবীকে গোলাকার বলে মনে করতেন। নক্ষত্রমণ্ডলীর পূব থেকে পশ্চিমের গতিকে তখনকার দিনে তারকাদের প্রকৃত গতি হিসেবেই দেখা হত। পিথাগোরাসই প্রথম বলেন যে পৃথিবী আপন অক্ষের চারদিকে আবর্তিত মনে করে নিলে, তারকাদের গতিকে 'আপাতগতি' হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

পিথাগোরাসের উক্তির মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কিন্তু তখন কোন কাজে লাগল না। বিখ্যাত ইংরেজ পরমাণুবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বলেছিলেন—

'বিজ্ঞানের এক বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে মানুষের মন তৈরী না হ'লে কোন আবিষ্কার সহজে হয় না।'

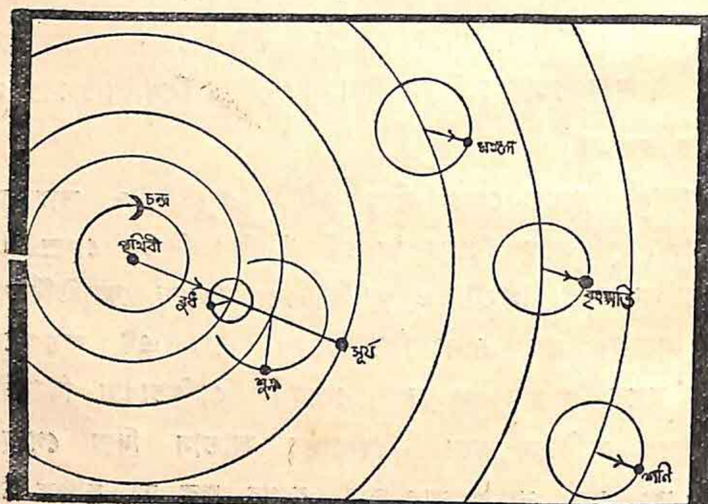
পিথাগোরাসের মতামতের জন্য তখনকার মানুষের মন তৈরী হয়নি। তখনকার সমাজের কাছে এ মতের কোন মূল্য ছিলনা। সমসাময়িক বিজ্ঞান বা দর্শনের কাছে এ মতের সত্যাসত্য বিচার করার উপযুক্ত কোন হাতিয়ার ছিল না। তাই পিথাগোরাসের মত সমাদৃত হল না।

পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রীক মনীষি প্লুটো ও তার ছাত্র আরিষ্টটল পৃথিবীকে বিশ্বের 'স্বাভাবিক' স্থির নিশ্চল কেন্দ্র বলে ঘোষণা করলেন। প্লূটো ও অ্যারিষ্টটলের মতবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অন্ধকার যুগ এনে দিয়েছিল। অবশ্য এই অন্ধকারেও মাঝে মাঝে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে। প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা যুগসীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বসত্যের আভাস দিয়ে গেছেন। কেউ তা গ্রহণ না করলেও ভাবী যুগের জন্য তা সঞ্চিত রয়ে গেছে।

মহামতি আলেক্জাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ও টলেমীরাজদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সুসমৃদ্ধ আলেক্জান্দ্রিয়া মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরিষ্টার্কাস্, অ্যারিষ্টটলের মতের বিরোধিতা করে ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ছু'হাজার বছর পরে এই তথ্যকেই পোল্যাণ্ডের ধর্মযাজক কোপার-নিকাস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

খালি চোখে আকাশে প্রায় ছ' হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। এদের পারস্পরিক অবস্থান ছু' চার বছরে কিছু বদলায় না। গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস্ এই নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রামাণ্য নক্সা তৈরী করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৩৯ গুণ। গ্রহগতি সম্বন্ধে 'এপিসাইকেলের' ধারণাও তাঁর প্রবর্তিত। হিপার্কাসের আকাশ চিত্র পরবর্তীকালে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আলেক্জান্দ্রিয়ার মনীষি ক্লডিয়াস টলেমী 'আলমাজেষ্ট' গ্রন্থে ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব উপস্থিত করেন।



টলেমির বিশ্বচিত্র

আলেক্‌জান্দ্রিয়া টলেমীরাজদের দ্বারা শাসিত হত। ক্লডিয়াস টলেমীর সঙ্গে কিন্তু রাজপরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি বললেন যে পৃথিবীই বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

অ্যারিষ্টটল ও টলেমী বৃত্তগতিকেই বিশ্বের স্বাভাবিক গতি বলতেন, পৃথিবীকে বিশ্বের স্বাভাবিক কেন্দ্র বলে মনে করতেন। বিশ্বকে তাঁরা দেখতেন বহু স্বচ্ছ স্ফটিক গোলকের সমবায় হিসেবে। বিশ্বের শেষ সীমায়, দূরতম গোলকটির ওপরে নক্ষত্ররা অবস্থিত বলে কল্পনা করা হত। চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রত্যেক গ্রহকে এক একটি স্বতন্ত্র স্ফটিক গোলকের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ওরা বলতেন যে স্ফটিকগোলকগুলিকে দেবদূতেরা ঘোরায়।

টলেমীর মূল পরিকল্পনায় দেখান হয়েছিল যে নক্ষত্রগণ ও সূর্য্য খাঁটি বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই বৃত্তপথকে ডেফারেণ্ট বলা হত। গ্রহদের গতির কল্পনা ছিল কিছু জটিল। প্রত্যেক গ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অস্তিত্বহীন কল্পগ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এক বৃত্তাকার ডেফারেণ্ট পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃত গ্রহটি এই কল্পগ্রহের চারদিকে বৃত্তাকার এপিসাইকেল পথে সঞ্চারমান বলে কল্পনা করা হল। চন্দ্রের অবশ্য সূর্য্য ও তারকাদের মত ডেফারেণ্টই ছিল, এপিসাইকেল ছিল না।

এই চিত্র দিয়েও গ্রহাদির অবস্থানের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হল না। ফলে ক্রমেই এপিসাইকেলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত ৮০টি বৃত্তদ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে টলেমীর তত্ত্ব এক জটিল ও দুর্বোধ্য জ্যামিতিক কসরতে পরিণত হল। তখনকার সমাজে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান যতটুকু জানলে কাজ চলত, তারপক্ষে কিন্তু টলেমীর তত্ত্ব ও হিসাব যথেষ্টই ছিল। তাই টলেমীর তত্ত্ব সত্যের মর্য্যাদা পেয়েছিল।

টলেমীর পরে দীর্ঘ সতেরশ' বছর জ্যোতির্বিজ্ঞান বন্ধ্যা হয়ে রইল। সামন্তসমাজের স্থিতিশীলতা ও শ্বাসরোধী প্রভাবই ছিল এর জন্য দায়ী। টলেমীর গণিত আর অ্যারিষ্টটলের দর্শনের চেয়ে বেশী কিছু সামন্তদের প্রয়োজনে লাগত না।

ইতিমধ্যে ভগবানের পুত্র বলে কথিত যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন ও আপন ধর্মমত প্রচার করলেন। কালক্রমে টলেমীর তত্ত্ব খৃষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অ্যারিষ্টটলের দর্শন ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে লাগল।

খৃষ্টধর্মের মূল সংগঠন ছিল চার্চ। রোম সহরের অধিবাসী পোপ ছিলেন এই সংগঠনের সর্বাধিনায়ক। যে যুগে সব পথই রোমের দিকে নির্দেশ করত, ইতিহাসের অসম গতিতে সে যুগ অতীত হয়ে গেল। রোম সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হল। কিন্তু তাতে চার্চের শক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলনা। মধ্যযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারক হিসেবে চার্চ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠল। চার্চ বহু স্কুল কলেজ হাসপাতাল চালাত, দুস্থ আতুরদের সাহায্য করত, দয়া ও প্রেমের বাণী প্রচার করত। অন্যদিকে চার্চ বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিল। য়ুরোপের মোট জমির তিন ভাগের এক ভাগই ছিল চার্চের হাতে। এই জমিতে নিযুক্ত ভূমিদাসদের চার্চ অতি নির্মমভাবে শোষণ করত। নরকের ভয় দেখিয়ে চার্চ নানা বিচিত্র কর আদায় করে নিত। ধর্মযাজকদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ থাকায় চার্চের সম্পত্তি কখনও ভাগ হয়ে যেতে পারত না। অন্যান্য সব সামন্তের চেয়েই চার্চ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রজাদোহন চালিয়ে যেত। ফলে সামন্তপ্রথা ও সামন্তদর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থক ও রক্ষকই ছিল চার্চ।

ভূমিদাসদের দমনে রাখার জন্য, অন্যান্য সামন্তের বিরুদ্ধে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেক সামন্তকেই সৈন্যদল রাখতে

হত। চার্চের অবশ্য শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু সর্বদা এর ওপর নির্ভর করা যেত না বলে পোপকে সশস্ত্র সংগঠন ও এক নিষ্ঠুর ধর্মীয় আদালতের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। এই আদালতের নাম ছিল 'ইন্‌কুইজিসন।' এর কর্তারা সর্বত্র তদন্ত করে বেড়াতেন। যাদের এরা ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন, তাদের ধরে এনে বিচারের প্রহসন করে হত্যা করা হত। প্রচলিত বিশ্বাস বজায় রাখার কাজে এই 'ইন্‌কুইজিসন' এক মহাপরাক্রান্ত নির্মম সংগঠন হয়েছ উঠেছিল।

খৃষ্টধর্ম অন্যান্য বহু ধর্মের মতই ন্যায়, প্রেম, ক্ষমা ও দয়ার ধর্ম্ম বলে প্রচারিত হত। তবু খৃষ্টধর্মের নায়কেরা এমন নির্মম রক্ত-অভিযান চালালেন কি যুক্তিতে ?

যুক্তিটা এই। যারা অবিশ্বাসী, অনন্ত নরকবাস তাদের নিশ্চিত। অত্যাচার করলে তারা যদি দোষ স্বীকার করে ও অনুতাপ করে তো তাতে তাদেরই উপকার, তারাই নরকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে স্বর্গে যাবে। আর যদি তারা অনুতপ্ত না হয় তো তাদের বাঁচতে দিলে তারা অন্যকে অবিশ্বাসী করে তার নরক যন্ত্রনা ভোগের কারণ হবে। অতএব এ রকম লোককে যত তাড়াতাড়ি নরকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

যে সব বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রত্যক্ষভাবে খৃষ্টধর্মের দর্শনের বিরোধিতা করেনি, সেগুলিকে চার্চ ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের চক্ষে দেখত বটে কিন্তু চার্চের সন্ত্রাসের ফলে বাইবেল বিরোধী নতুন ধারণার প্রচার করার ঝুঁকি বড় বেশী হয়ে উঠল। বিজ্ঞানকে ধর্মের কবল থেকে মুক্ত করার কথা তখন তোলা যেত প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করার পরে। ফলে চার্চ-ই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্মুখগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

য়ুরোপে যখন নতুনের বিরুদ্ধে এই ধর্মযুদ্ধ চলছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে জোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চা হয়েছিল। ভারতীয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানও অতি প্রাচীন। খৃষ্টের জন্মের সাড়ে চারশ বছর পরে আর্যভট ঘোষণা করেন যে গ্রহরা সূর্য্যের চারদিকে ডিম্বরেখাকার উপবৃত্তপথে ঘুরে বেড়ায়। তিনি বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির প্রদক্ষিণকালও নির্ণয় করেন। দ্বাদশ শতকে ভাস্কর আচার্য 'সিদ্ধান্তশিরোমনি' গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যার নানা তথ্য উপস্থিত করেন। এই গ্রন্থেই মহাকর্ষের বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রথম উপস্থিত করা হয়। তিনি লেখেন—

"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি।
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং সশক্ত্যা।
সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥"

—পৃথিবীর আকর্ষণেই বস্তু নিম্নাভিমুখী হয়। পারস্পরিক আকর্ষণই জ্যোতিষ্কদের আপন আপন কক্ষে থাকতে বাধ্য করে।

একথা উল্লেখযোগ্য যে আর্যভটের উপবৃত্তাকার পথের ধারণায় কেপলার উপনীত হন ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। নিউটন মহাকর্ষকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষভাগে।

আর্যভট বা ভাস্কর আচার্যের মত নিঃসন্দেহে দার্শনিক ভবিষ্যৎ দর্শন। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ এর জন্য তৈরী ছিল না। তাই এসব মত -অবজ্ঞাত থেকেই অতীত হয়েছে। কিন্তু পিথাগোরাস ও আরিষ্টার্কাসের দার্শনিক প্রেক্ষা পরবর্তীযুগের বিজ্ঞানীদের কাছে যে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা তা পাননি। তার কারণ এই যে দীর্ঘদিন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত থেকে আমাদের অতীত গৌরবময় কীর্ত্তি অবজ্ঞাত হয়েছে। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও আমরা আমাদের প্রাপ্য সমাদর লাভ করতে পারিনি।

য়ুরোপে ইন্‌কুইজিশনের অত্যাচার থেকেই বোঝা যায় যে নতুন মতের আবির্ভাব সূচিত হচ্ছিল। সামন্ত সমাজ তার অনড় অচল অস্তিত্ব

বজায় রাখতে পারছিল না। সে সমাজের কাঠামোতে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিকাশের ফলে সমাজে ধনিক শ্রেণী দেখা দিয়েছিল। ছোট ছোট কারখানায় শ্রমিক শ্রেণীও জন্ম নিয়েছিল। তাদের চোখে সামন্তব্যবস্থা ছিল বিকাশবিরোধী বন্ধন মাত্র। তাই পুরাতন স্বার্থের সঙ্গে নতুন স্বার্থের সর্বক্ষেত্রে সংঘাত দেখা দিল।

চার্চের কর্তৃত্বে আঘাত না করে সামন্তব্যবস্থার পতন ঘটানো সম্ভব ছিল না। নবোদ্ভূত জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার সঙ্গেও চার্চের কর্তৃত্বের অসঙ্গতি ছিল। শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য উন্নত ধরণের কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নতুন বিশ্বদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিল।

এই নবজাগরণের যুগই ইতিহাসে 'রেঁনেসা'ও 'রিফরমেশনের' যুগ নামে খ্যাত। এই যুগে সর্বক্ষেত্রে, জীবনের সর্বদিকে পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুন কথা বলে উঠেছিল। এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লুথারপ্রমুখ ধর্মযাজকেরা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতের আন্দোলন তুললেন।

সমাজে যখন পরিবর্তনের কম্পন দেখা দেয়, সমাজ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ করে, তখন তাকে রোধ করার শক্তি কোন পরাক্রান্ত সংগঠনেরও আর থাকে না। তাই চার্চের অমিতবিক্রম সত্বেও বিজ্ঞানে নতুন ধারণা দেখা দিল, বিজ্ঞানকে ধর্মের কবল থেকে মুক্ত করে স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন দেখা দিল। নবজাগরণের যুগে যে নববিজ্ঞানের জন্ম হল তারই প্রথম প্রবক্তা হলেন নিকোলাস কোপারনিকাস। দীর্ঘ সতেরশ' বছর পরে এই মনীষির প্রতিভাস্পর্শে গতিশীল বিশ্বে পৃথিবী আপন গতির রহস্য মানুষের মননের কাছে খুলে ধরল, বিজ্ঞান ধর্মের কবল থেকে মুক্ত হ'ল।

[দুই]

নিকোলাস কোপারনিকাস

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, পোল্যাণ্ডের থর্ণ সহরে নিকোলাস কোপারনিকাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সহরের নামজাদা লোক। মাও ধনীপরিবারের মেয়ে ছিলেন। কাকা ছিলেন নামকরা ধর্মযাজক। দশ বৎসর বয়সেই কোপারনিকাস পিতৃহীন হন। কাকা তাকে ধর্মযাজক হিসেবে শিক্ষা দিতে লাগলেন।



নিকোলাস কোরারনিকাস

তখনকার দিনে ধর্মযাজকদের নানাদেশ ঘুরে নানা বিষয়ে শিক্ষা নিতে হত। সে যুগের জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখায়ই দক্ষ ছিলেন। কোপারনিকাসের পূর্ববর্তী মনীষি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একাধারে চিত্রকর ভাস্কর, স্থপতি, সামরিক যন্ত্র বিশেষজ্ঞ, পদার্থবিদ্, শরীরতত্ত্ববিদ্, ইত্যাদি ছিলেন। কোপারনিকাসকেও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখায় শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল।

ক্র্যাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন মাত্র আঠার বছর বয়সে। তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ ব্রুড্‌জেভ্‌স্কি এখানে অধ্যাপনা করতেন। কোপারনিকাসেরও আবার সবচেয়ে ভাল লাগত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্র। কিন্তু কাকা বলতেন—'আকাশের দিকে বেশী না দেখে, মাটির দিকে ভাল করে তাকাও, ভাল করে ডাক্তারি শেখ।'

কোপারনিকাস শব্দের অর্থই হল বিনীত। সারা জীবনই কোপারনিকাস সকলের সঙ্গে বিনীত ব্যবহার করে গেছেন। কাকার উপদেশ মেনে নিয়ে তিনি ডাক্তারি ও অন্যান্য ব্যবহারিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য ইতালীতে চলে গেলেন। পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যয়ন করে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এই সময়ে চিত্রাঙ্কণেও তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে বোলোগ্না ও ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন, অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকার নির্দেশ মেনে নিলেও অন্তরের দিগ্দর্শন যন্ত্রকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে কোপারনিকাস রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু নবজাগরণের প্রভাব ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানে অনুভূত হচ্ছিল। আরিষ্টার্কাসের ধারণা আবার ফিরে আসছিল। টলেমীর স্থিরবিশ্বের মতের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছিল।

ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লসের ব্যাক্তিগত পরামর্শদাতা ওরসিমি চতুর্দশ শতাব্দীতে এ্যারিষ্টটলের মতবাদের বিরুদ্ধে গতিশীল পৃথিবীর ধারণা প্রচার করেন। কুসার নিকোলাস ঘোষণা করেন যে 'সব নক্ষত্রের মত' পৃথিবীও গতিশীল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বললেন যে 'কেবলমাত্র পরীক্ষার সাহায্যেই সত্যে উপনীত হওয়া যায়।' বোলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোমিনিকো নোভারো টলেমী ও অ্যারিষ্টটলের মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। কোপারনিকাস নোভারোর ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত শিক্ষকের অবিশ্বাস ছাত্রের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানে কোপারনিকাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পিথাগোরাসের শিষ্যপ্রশিষ্যরা বলতেন যে বিশ্বের প্রকৃত সত্য সরল,

সুন্দর ও সুসমন্বিত সম্পর্কের সাহায্যে প্রকাশ করা যাবে। কোপারনিকাস একথায় বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন—

'সিসেরো লিখেছিলেন যে হিসেটাস্ ভাবত যে পৃথিবী গতিশীল... এবং প্লুটার্ক বলেছেন যে আরও অনেকে এই মতে বিশ্বাস করত।'

প্রাচীন শাস্ত্রে জ্ঞান, সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রভাব ও সমাজের জাগরণশীল শক্তিগুলির বাস্তব ও দার্শনিক প্রয়োজন, কোপারনিকাসকে নতুনভাবে বিশ্বসত্যের সন্ধান করতে বসাল।

যে সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে সে কি করে ছাত্রদের বিশ্বসত্য শেখাবে? কোপারনিকাস টলেমীর মতবাদে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাই সেই মতই ছাত্রদের শেখাতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি এই পাপচক্র থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। এমন কাজ খুঁজতে লাগলেন যাতে তিনি বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে নিরালায় কাজ করার অবসর পান। ফ্রয়েনবার্গ গ্রামে ধর্মযাজকের কাজ নিয়ে কোপারনিকাস রোম ছেড়ে চলে গেলেন। তার বয়স তখন ত্রিশ বছর।

ফ্রয়েনবার্গের ধর্মযাজক যে কেবল ধর্ম আর আকাশের কথাই ভাবতেন তা নয়। তিনি সহকর্মীদের ও দরিদ্রদের রোগের চিকিৎসা করতেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে তিনি অনেককে মুক্ত করতে পারতেন। অনেক চিকিৎসকও তার পরামর্শ নিতে আসতেন।

ফ্রয়েনবার্গ ছিল একটি ছোট পাহাড়ের ওপরে। নদী ছিল প্রায় দু' মাইল দূরে। গ্রামবাসীদের জল বয়ে আনতে খুব কষ্ট হত। কোপারনিকাস বাঁধ বেঁধে দিয়ে ও একটি যন্ত্র বসিয়ে নদীর জল গ্রামে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গ্রামের অধিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন দয়া ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক।

রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সমস্যায়ও পোল সরকার মাঝে মাঝে কোপারনিকাসের পরামর্শ নিতেন। অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি একখানি

গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মুদ্রানীতি সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করছিলেন ও তার মতামত পোল সরকারকে জানিয়েছিলেন! তখন দেশের এক এক জন ব্যারণ এক এক রকম মুদ্রা তৈরী করত। ফলে সারা দেশে এক মুদ্রাপদ্ধতির অভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের খুব ক্ষতি হত। আবার ব্যারণ বা রাজারা লোভের বশবর্তী হয়ে মাঝে মাঝে মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দিত। তার ফলেও দেশের ব্যবসায়ীদের খুব ক্ষতি হত। কোপারনিকাস শিল্প ও বাণিজ্যের অধিপতিদের পক্ষ হয়ে সারা দেশে একই মুদ্রাপদ্ধতির প্রচলন দাবী করলেন। তিনি আরও বললেন যে কিছুতেই মুদ্রার মূল্যমান কমান চলবে না। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আর একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তই পরে অর্থনীতিতে গ্রেসামসূত্র বলে খ্যাত হয়।

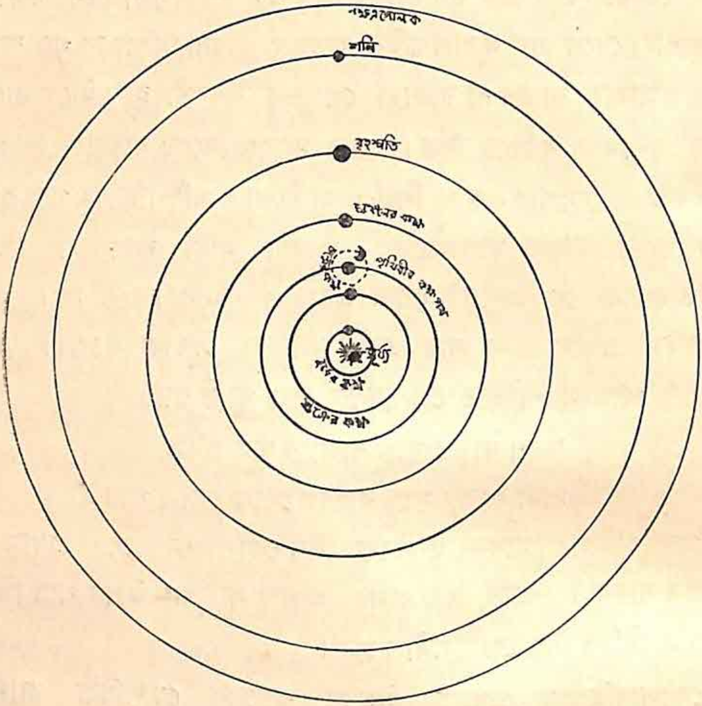
'সস্তা ধাতুর মুদ্রা বাজারে চালু হ'লে,
দামী ধাতুর মুদ্রা বাজার থেকে লোপ পায়।'

জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণাই অবশ্য ছিল কোপারনিকাসের প্রধান ও প্রিয়তম সাধনা। প্রায় ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে তিনি কতগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

কোপারনিকাস প্রথমত সিদ্ধান্ত করলেন যে পৃথিবী আপন অক্ষের চারদিকে আবর্তনশীল। আমরা কিন্তু এগতি সম্বন্ধে সজ্ঞান নই। আমাদের তাই মনে হয় যে জ্যোতিষ্করাই পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনই প্রকৃত। আকাশপটে জ্যোতিষ্কদের আপাত আবর্তন পৃথিবীর প্রকৃত আবর্তনের প্রতিফলন মাত্র। ইনিড্ কাব্যে যেমন ভার্জিল বলেছেন যে জাহাজ বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়লে, দেশ ও নগর পেছনে সরে যায়।

কোপারনিকাসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে সূর্য্যই কেন্দ্রস্থিত জ্যোতিষ্ক, পৃথিবী নয়। প্রত্যেক গ্রহই নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে, আপন আপন বৃত্তপথে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেবলমাত্র চন্দ্রই

পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তপথে ঘোরে। তারকারা খুব দূরে থেকে বৃত্তপথে সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে।



কোপারনিকাসের মূল বিশ্বচিত্র

এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি বেশ সরল, সুন্দর ও সুসমন্বিত হওয়ায়, পিথাগোরাসবাদীদের বিশ্বসত্যের সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। কিন্তু প্রত্যেক মতবাদকেই বাস্তবের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে হয়। কোপারনিকাসকেও তার মতবাদের সাহায্যে গ্রহাদির অবস্থান ও গতির ব্যাখ্যা দিতে হ'ল। এই হিসাবপত্র করতে তার প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ কোপারনিকাস নিজে ভাল পর্য্যবেক্ষক ছিলেন না। বিভিন্ন জ্যোতির্বিদেরা

যে সব নক্সা ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার কোনটি কতটা নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে কোপারনিকাসের ধারণা স্পষ্ট ছিলনা। ফলে পরিশ্রমের মাত্রা ও সময় খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে বৃত্তগতিই বিশ্বের স্বাভাবিক গতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কোপারনিকাসের পক্ষেও এই ধারণাকে অতিক্রম করে, অন্য কোন পথে সত্যের সন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তখনকার দিনে দূরবীণ ছিল না। বিভিন্ন জ্যোতির্বিদের সংগ্রহ করা তথ্যের মধ্যে প্রায়ই ভুল ও অসামঞ্জস্য থেকে যেত। তবু সে সব তথ্য থেকেও একথা স্পষ্ট হল যে শুধুমাত্র বৃত্তগতির সাহায্যে আকাশপটের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

এই সন্ধিস্থলে এসে কোপারনিকাসের প্রয়োজন ছিল বৃত্তগতির ধারণা ত্যাগ করে আরও নতুনের দিকে. আরও বিপ্লবীধারণার দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাহলে হয়ত তিনি উপবৃত্তের ধারণায় উপনীত হতে পারতেন।

কিন্তু তা হল না। যুগচিন্তা তাকে হিপার্কাস ও টলেমী প্রবর্তিত এপিসাইকেলের ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য করল। আবার সেই টলেমীর বহুবৃত্তের ধারণা গৃহীত হ'ল। কোপারনিকাসের সমগ্র পদ্ধতিতে ৩৪টি বৃত্ত দেখা দিল। ফলে কেন্দ্রীয় ধারণা 'সরল, সুন্দর ও সুসমন্বিত' হওয়া সত্বেও সমগ্র মতবাদটি যথেষ্ট জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। কোপারনিকাস কিন্তু ঘটনাবলীর একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দিতে পেরে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তখনও তার মত প্রকাশ করলেন না। প্রায় দশ বছর পরে (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) তার বন্ধু রেটিকাস কোপারনিকানবাদের সংক্ষিপ্তরূপ প্রকাশ করেন।

মত প্রকাশে কোপারনিকাসের এই দ্বিধা ও বিলম্বের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লিখেছেন—

'আমি ভাবতাম যে পৃথিবী ঘুরছে বললে লোকে ভাববে যে

এ এক অবাস্তব রূপকথা .....এই অভিনব ও অবিশ্বাস্য মতের প্রতি যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হ'বে, তারই ভয়ে লেখা শেষ করেও প্রকাশ করিনি।'

নতুন মতবাদের বিরুদ্ধে চার্চের জেহাদ, ইন্‌কুইজিসনের কার্য্য-কলাপ, কিছুই কোপারনিকাসের অজানা ছিল না।

কোপারনিকাসের সংক্ষিপ্ত মতবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। পোপও তার সাঙ্গপাঙ্গেরা এই মতবাদের বিপ্লবী সম্ভাবনা ধরতে পারেননি। তাদের বিচারে কোপারনিকাসের মত ছিল আংশিক কল্পনাবিলাস মাত্র। তাই কোন কোন ধর্মনেতা কোপারনিকাসকে তার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করতেও উৎসাহ দিলেন।

লুথার পন্থীরা পোপের বিরোধী ছিল বটে। কিন্তু প্রগতির বিরুদ্ধে তাদেরও নৃশংসতার শেষ ছিল না। কোপারনিকাসের মতবাদের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী তাৎপর্য্য তারা পোপের চেয়েও ভাল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা সুরু থেকেই নানা কুযুক্তি রচনা করে এই মতবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। লুথার লিখেছিলেন—

'পুণ্যগ্রন্থে এই কথাই লিখেছে যে যীশু
সূর্য্যকে স্থির হ'তে বললেন—পৃথিবীকে নয়।'

কোপারনিকাস তার বন্ধু রেটিকাসকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থখানি প্রকাশ করার ভার দিলেন। রেটিকাস কাজটা চাপালেন আন্দ্রে ওসিয়াণ্ডারের ওপর।

ওসিয়াণ্ডার ছিলেন গোঁড়া লুথারপন্থী। কোপারনিকাসের মতবাদে তার বিশ্বাস ছিল না। তিনি কোপারনিকাস লিখিত ভূমিকাটি সরিয়ে ফেলে, নিজেই তার নামে এক ভূমিকা লিখলেন। তাতে বলা হ'ল যে গ্রন্থে বর্ণিত মত 'দৃঢ়লব্ধ সত্য নয়, আংকিক হিসাবের ভিত্তি মাত্র, ঘটনাবলীর সম্ভাব্য চিত্রমাত্র ; তা সত্য না হওয়াই সম্ভব।' এইভাবে ওসিয়াণ্ডার পাঠকের মনকে কোপারনিকাসের মতবাদ সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা করলেন।

কোপারনিকাসের মত আরিষ্টার্কাসের ধারণার কাছে নিঃসন্দেহে ঋণী ছিল। কোপারনিকাস তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিতে চারবার আরিষ্টার্কাসের মতামতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সৌরকেন্দ্রিক ধারণা ওসিয়াণ্ডারের এতই অপ্রিয় ছিল যে তিনি গ্রন্থ থেকে আরিষ্টার্কাসের নাম নিঃশেষে তুলে দিয়েছিলেন। ফলে মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বহু লোকে কোপারনিকাসের নিন্দা করে বলেছে যে তিনি আরিষ্টার্কাসের কাছে কোন ঋণ স্বীকার করেননি।

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ওসিয়াণ্ডার যখন গ্রন্থখানি প্রকাশ করলেন, কোপারনিকাস তখন পক্ষাঘাতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এর কিছুদিনের মধ্যেই কোপারনিকাস প্রাণত্যাগ করেন।

কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থে টলেমীবাদের বিরুদ্ধে নির্ভুল যুক্তি উপস্থিত করে গিয়েছিলেন। ওরা বলত যে পৃথিবীর আহ্নিকগতি থাকলে এমন তীব্র বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হ'ত যে কোন পাখী নীড় ছেড়ে বেরোলে আর কখনও ফিরে আসতে পারত না। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সঙ্গে ঘোরে এই তথ্য উপস্থিত করে কোপারনিকাস তাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। ওরা বলত যে আহ্নিকগতি থাকলে পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। কোপারনিকাস বললেন যে পৃথিবীর আহ্নিকগতি না থাকলে দূরবর্তী তারকারা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। তা হ'লে তারকাদের গতি হবে আরও অনেক তীব্র। সেক্ষেত্রে তারকারাই বা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে না কেন?

কোন লোক যদি বৃত্তাকার পথে ঘোরে তো দূরবর্তী নিশ্চল বস্তু থেকে তার দূরত্ব কমবে বাড়বে। লোকটির কাছে ঐ নিশ্চল বস্তুর দূরত্ব ও আপেক্ষিক অবস্থান সতত পরিবর্তনশীল মনে হ'বে। 'মেরি-গো-রাউণ্ডে' ঘুরে বেড়ালে কোন স্থির ব্যক্তি বা বৃক্ষের দূরত্ব ও আপেক্ষিক অবস্থানের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। টলেমীবাদীরা এই

তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুললেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ালে নক্ষত্রদের আপেক্ষিক অবস্থান সারা বছর ধরে বদলায় না কেন ?

কোপারনিকাসের সময়ে নক্ষত্রদের অবস্থানের এই তারতম্য দেখার কোন উপায় ছিল না। পরবর্তীকালে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়ে এই বার্ষিক তারতম্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। কোপার-নিকাস কিন্তু নির্ভুলভাবেই বলেছিলেন যে তারকাদের দূরত্ব অত্যন্ত বেশী বলে এই তারতম্যের পরিমাণ হয় অত্যন্ত কম। তাই তা চোখে ধরা পড়ে না।

কোপারনিকাসের এই অভ্রান্ত যুক্তিবিচার একথা স্পষ্ট করে যে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব তাঁর কাছে মোটেই 'আংকিক হিসাবের ভিত্তি' ছিল না। তাঁর কাছে এ ছিল দৃঢ়লব্ধ সত্য।

বইখানা, কোপারনিকাস অবস্থা সহজ করার জন্য পোপকেই নিবেদন করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন—

'পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে একথা প্রমাণ করার জন্যই বইখানি লেখা।'

কোপারনিকানবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটি যে ছিল না তা নয়। বৃত্ত ধারণা ত্যাগ করতে না পারার ফলে ৩৪টি বৃত্তের কল্পনা করতে হয়েছিল। লোকে বলত যে কোপারনিকাস টলেমীর ৮০টি বৃত্তকে কমিয়ে ৩৪টি করেছেন মাত্র। ৩৪টি বৃত্ত দিয়েও যে গ্রহাদির অবস্থানের সূক্ষ্ম হিসেব মেলান গেল তা নয়। একটা মোটামুটী মিল হল মাত্র। তা ছাড়া ওসিয়াণ্ডারের কার্য্যকলাপ গ্রন্থখানি ও কোপারনিকানবাদের মর্য্যাদার যথেষ্ট হানি করেছিল।

অন্যদিকে কোপারনিকানবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা ও মূল সত্যের শক্তি ছিল অসাধারণ, সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ছিল অনস্বীকার্য্য। নির্ভুল ও বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে কোপারনিকাস ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমাধি দিয়ে গিয়েছিলেন।

কোপারনিকাসের মননে যেমন পুরাতন বৃত্তধারণা নতুন সৌর-কেন্দ্রিক ধারণার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, বিজ্ঞানের জগতেও তেমনি ভূকেন্দ্রবাদীরা কোপারনিকানবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। মতামতের সংঘর্ষ অবশ্য বিজ্ঞানে অভাবনীয় কিছু নয়। কিন্তু কোপারনিকানবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু পুঁথিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইন্‌কুইজিসনের রথচক্র ঘর্ঘরশব্দে নির্মম গতিতে এগিয়ে এসেছিল, বিজ্ঞানসেবীদের পুড়িয়ে মারার জন্য চিতা সজ্জিত হয়েছিল।

কিন্তু নবলব্ধ সত্যের জন্য যাঁরা লড়েছিলেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'পরীক্ষার সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া'র পদ্ধতিকে যাঁরা অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরাই ছিলেন বিজ্ঞানের প্রগতিশীল শক্তি। তাঁদের চেষ্টায়ই বিজ্ঞান সমাজের বিকাশে দ্রুত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছিল। যারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সভ্যতা ও প্রাচীন অন্ধধর্মের প্রতিভূ। তাদের পরাজয় ও বিলুপ্তি ছিল অপরিহার্য্য। তাই ইতিহাস সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের বিরোধীদের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু সোনার আখরে আপন বুকে লিখে রেখেছে জিওরদানো ব্রুনো, জন কেপলার ও গ্যালিলিও গ্যালিলির নাম।

[তিন]

জিওরদানো ব্রুনো

১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ভিনিসের নিকটবর্তী নোলা সহরে জিওরদানো ব্রুনো জন্মগ্রহণ করেন। পনের বছর বয়সেই তিনি ডোমিনিসিয়ার প্রজাতন্ত্রের নাগরিক অধিকার লাভ করেন।

তখনকার দিনের মনীষিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন কোপারনিকানবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, প্রচার করেছিলেন ব্রুনো তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ব্রুনোর সঙ্গে কোপারনিকাসের ব্যক্তিগতভাবে কোন মিলই ছিল না।

কোপারনিকাস ছিলেন একজন সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠাবান ধর্মযাজক। জিওরদানো ছিলেন এক অতি অখ্যাত অজ্ঞাত সাধু। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপলব্ধ সত্য প্রকাশে কোপারনিকাসের দ্বিধা ও বিলম্বের শেষ ছিলনা। আর ব্রুনোর চরিত্র ছিল অতি ঋজু। দ্বিধা, শঙ্কা বলে তিনি কিছু জানতেন না। অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাঁকে চালিত করত। সত্যের সাধনায় জীবনকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। এদের মত মহাপুরুষের কথাই রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

'নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।'

লেখাপড়া শেষ করেই ব্রুনো প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপন মত প্রচার করতে সুরু করেন। যীশুর জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করলেন তিনি। ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে মদ থেকে যীশুর রক্ত ও

রুটি থেকে যীশুর মাংস হয়েছিল। ব্রুনো এই অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজগুবি বলে ঘোষণা করলেন।

তাঁর এই কাজের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরী হ'ল না। ইনকুইজিসন তাঁকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে জিওরদানো একথা জানতে পারলেন। তাই তিনি ইতালী ত্যাগ করলেন।

য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। প্রথমে গেলেন লিয়নস্, তারপরে তুঁলো, মন্ট্‌-পেলিয়ার ও প্যারী। সর্বশেষে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীনই তিনি তিনখানা বই প্রকাশ করে আপন মতবাদ উপস্থিত করেন।

ব্রুনো লিখলেন যে প্রকৃতি জীবন ও সৌন্দর্য্যে ভরা, ঈশ্বরের প্রাণশক্তিতে সদা স্পন্দমান ও কর্মচঞ্চল। ঈশ্বর অসীম, অতএব বিশ্বও অসীম। ঈশ্বর শুধু একটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এমন ভাবলে তার সীমাহীনতার প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতে বহু সৌরজগত আছে। প্রত্যেক সৌরজগতের কেন্দ্রেই আছে সূর্য্যের মত একটি নক্ষত্র।

কোপারনিকাস একথা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে বিশ্বজগতে পৃথিবী এক ক্ষুদ্র কণিকামাত্র। ব্রুনো এই ধারণাকেই বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে তুললেন। তিনি সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সুদূর নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত করে নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার জন্ম দিলেন।

কোপারনিকাস বিশ্বজগতের রাজসিংহাসন থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে সূর্য্যকে বসিয়েছিলেন। জিওরদানো সূর্য্যকেও বিশ্বকেন্দ্র থেকে চ্যুত করলেন। তিনি লিখলেন—

'বিশ্ব অসীম। তাই তার কেন্দ্রে বা প্রান্তে কেউ আছে, একথা বলা অর্থহীন।'

কি জ্যোতির্বিদ্যায় কি দর্শনে ব্রুনোর মতামত ছিল বিপ্লবাত্মক। চার্চ যুগ যুগ ধরে যে সব ধারণা প্রচার করে এসেছিল, ব্রুনো সে সবের ওপরে প্রত্যক্ষ আঘাত হানলেন। খৃষ্টধর্ম স্বভাবতই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকে পৃথক করে দেখত। ব্রুনো বললেন যে স্রষ্টার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, সৃষ্টির জীবন স্পন্দনেই স্রষ্টা প্রকাশিত। ধর্মে স্বর্গ ও নরকের পরিকল্পনা ছিল। নরক ছিল পৃথিবীর অভ্যন্তরে আর স্বর্গ নক্ষত্রমণ্ডলীর ওপারে। ব্রুনোর অসীম বিশ্বে স্বর্গের কোন স্থান রইল না। অগণিত পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের ধরাটিই কেন ঈশ্বরের সব করুণা লাভ করবে তার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হ'লনা।

কোপারনিকানবাদ এতদিক দিয়ে এত প্রত্যক্ষভাবে চার্চের দর্শনকে আঘাত করেনি। তাই চার্চ সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে 'আংকিক গণনার ভিত্তিমাত্র' বিবেচনা করে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পেরেছিল। কিন্তু ব্রুনোর বাণী চার্চের কর্তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করল।

জিওরদানোও এই সময়ে এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন থেকে গোপনে ইতালীতে ফিরে এলেন। ইন্কুই-জিসনের কিন্তু এ সংবাদ পেতে দেরী হ'লনা। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রুনো ধরা পড়লেন।

মতামতের ব্যাপারে, বিজ্ঞানের সাধনায় জিওরদানো যে ঋজুতা দেখিয়েছিলেন ধর্মান্ধদের অত্যাচারে তা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। সাত বছর তাঁকে কারাগারে আট্‌কে রেখে চার্চের মত গ্রহণ করবার জন্য অমানুষিক নির্য্যাতনের অধীন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি একটুও বিচলিত হননি, নিজ মত থেকে এতটুকুও পিছু হটেননি।

উপায়ান্তর না দেখে ওরা ব্রুনোর 'বিচারে'র ব্যবস্থা করল। ইন্কুই-জিসনের 'বিচার' ছিল এক অদ্ভুত প্রহসন। এখানে অভিযুক্তকে দোষী বলেই ধরে নেওয়া হত। আসামীরই দায়িত্ব ছিল নিজেকে নির্দোষ

প্রমাণ করা। যতদিন তা না হয় ততদিন দোষী হিসাবে তার ওপর নির্য্যাতন চালান ছিল সম্পূর্ণ বৈধ। বিচার হ'ত সম্পূর্ণ গোপনে। আদালতে কে কি বলল না বলল তা কাউকে জানতে দেওয়া হ'ত না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শিশুদের বা দাগী আসামীদের সাক্ষী নেওয়া যেত। কিন্তু অভিযুক্তেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে এরূপ কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করতে পারত না। সাক্ষীদের ওপর নির্য্যাতন চালানও ছিল বৈধ। ফলে আসামীর পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে আসত না। আসামীদের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করা যেত। কিন্তু কোন উকিলই অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করে ইনকুইজিসনের ক্রোধের পাত্র হ'তেন না। আসামীর ওপরে একই অত্যাচার বার বার করা অবৈধ ছিল। কিন্তু একই অত্যাচার-পদ্ধতিকে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা ছিল সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত।

এই সব বিধিব্যবস্থার অধীনে যে আদালত বসত, তার বিচারের রায় যে কি হ'বে তা লোকে আগেই বুঝতে পারত। জিওরদানোর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলনা। তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন।

ব্রুনোর লৌহদৃঢ় চরিত্রকে কিন্তু ওরা নোয়াতে পারেনি। তিনি ওদের বলেছিলেন—

"তোমরা আমার বিচার করছ, অথচ ভয় পেয়ে গেছ দেখি তোমরাই!"

এই ঘোষণাই ছিল সত্য। চার্চের দর্শনই ছিল ক্ষয়িষ্ণু, ব্রুনোর দর্শনই ছিল সত্য ও প্রগতির ধারক। পরাজয় আসন্ন বুঝেই ওরা ব্রুনোকে হত্যা করে জিততে চাইল।

ব্রুনোকে 'যথাসম্ভব দয়া দেখিয়ে, বিনা রক্তপাতে' শাস্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টধর্মকে ন্যায়, প্রেম, দয়া ও ক্ষমার ধর্ম বলে প্রচার করা হ'ত। অথচ সেই ধর্মের কর্তারা প্রাণদণ্ড

দেওয়ার ঐ বিচিত্র সূত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন। এর অর্থ ছিল চিতায় চড়িয়ে পুড়িয়ে মারা। ব্রুনোর পূর্বে বিজ্ঞানী সারভেটাস্ মানুষের শরীরে রক্তপ্রবাহের তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করার অপরাধে কেলভিন সজ্জিত চিতায় এইখানেই প্রাণ দিয়েছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ওরা ব্রুনোকে চিতায় পুড়িয়ে মারল। বিজ্ঞানের ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জীবনদীপ এইভাবে নির্বাপিত হ'ল।

কিন্তু সত্যকে এভাবে গলা টিপে হত্যা করা যায় না। রাণী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত চিকিৎসক উইলিয়াম গিল্‌বার্ট ব্রুনোর বিশ্বচিত্রকে গ্রহণ করলেন, প্রচার করলেন। অখ্যাত এক সাধুর সামান্য কয়েকখানা গ্রন্থের মর্মকথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল নানা দেশে, আদৃত হ'ল বিজ্ঞানে ও দর্শনে। মরেও ব্রুনো মানুষের চিন্তা জগতে অসীম প্রভাব বিস্তার করে চললেন। এরই নাম অমরত্ব।

[চার]

টাইকো ব্রাহী

কোপারনিকাসের মৃত্যুর তিন বছর পরে, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ডেন দেশের অন্তর্গত কুন্‌ডষ্ট্রাপ সহরে টাইকোব্রাহী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র। তখনকার দিনের জমিদারেরা বিলাসব্যসনেই দিন কাটাতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে টাইকোর শিক্ষিত ও জ্ঞানানুরাগী কাকা তাঁকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে টাইকো জমিদারদের কু-অভ্যাসগুলির দাস না হয়ে লেখাপড়ায় মন দেন। কাকা তাঁকে কোপনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।



টাইকো ব্রাহী

টাইকোর অন্তঃকরণ মায়া মমতায় ভরা থাকলেও তাঁর মেজাজ ছিল অতি রুক্ষ। যুবাবয়সে বদমেজাজের বশে মারামারি করতে গিয়ে তার নাকটা উড়ে যায়। বিন্দুমাত্র না দমে টাইকো সোনা আর রূপো দিয়ে একটা কৃত্রিম নাক তৈরী করে নিয়েছিলেন। এই ধাতব নাসিকাই তিনি আজীবন ব্যবহার করেছিলেন। লোকে ঠাট্টা করে বলত যে নাকটা কখন খসে পড়ে এই ভয়ে টাইকো সর্বদা সিমেণ্ট নিয়ে ঘোরেন।

শোনা যায় যে কোপনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই অগষ্ট টাইকো এক সূর্য্যগ্রহণ দেখেন। সেই থেকেই তিনি আজীবন জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

কোপনহেগেনের পরে টাইকো লিপ্‌জিগ্‌ উইটেনবর্গ, রোষ্টক ও বেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

দেশে যখন ফিরলেন ততদিনে তাঁর কাকা তাঁর জন্য কিছু বিত্ত রেখে পরলোকে গেছেন। এই সময় টাইকোর সঙ্গে হ্যাসির ল্যাণ্ড-গ্রেভের পরিচয় হয়। এই ভদ্রলোক নিজেও একজন জোতিবিদ ছিলেন। তিনি টাইকোকে জোতির্বিদ্যার গবেষণা করতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এইজন্য তিনি ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিককে ধরে টাইকোর জন্য একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই বৃত্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের ওপর ভরসা করে টাইকো কোপনহেগেন ও এলিসনরের মাঝামাঝি হুয়েন দ্বীপে তাঁর মানমন্দির গড়ে তুললেন। এর নাম দিলেন তিনি উরানিবর্গ।

এই মানমন্দিরকে জ্যোতির্বিদ্যার শ্রেষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্রে পরিনত করার জন্য তিনি শ্রম ও অর্থের কোন কার্পণ্য করেননি। ফলে বার বার তাঁকে রাজার কাছে অতিরিক্ত অর্থ চাইতে হয়েছে। ফ্রেডরিক অবশ্য টাইকোকে কখনও নিরাশ করেননি। টাইকো ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মানমন্দিরে গবেষণা চালিয়েছিলেন।

কোপারনিকাসের পরবর্তী কালে সে সব বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ্যায় কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন কোপারনিকানবাদী। টাইকো তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদ এতটুকুও বিশ্বাস করতেন না।

টাইকো বলতেন যে এই বিপুল পৃথিবীর পক্ষে গতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি বাইবেলের উক্তির সাহায্য নিয়েও তিনি কোপারনিকাসের মতামতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন।

তিনি টলেমীর পদ্ধতিকে সংস্কৃত করে একটিনিজস্ব পদ্ধতি উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনায় পৃথিবীই ছিল বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র। দূরবর্তী তারকারা ছিল বিশ্বের শেষ সীমায়। বলা হ'ল যে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার 'ডেফারেন্ট' পথে ঘুরে বেড়ায়, আর গ্রহেরা সূর্য্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার 'এপিসাইকেল' পথে ঘোরে। টাইকোর পদ্ধতি ছিল টলেমী ও কোপারনিকাসের দুই পদ্ধতির মধ্যে এক ধরণের আপোষ প্রচেষ্টা। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এই অর্থহীন পদ্ধতি কোনই রেখাপাত করতে পারেনি।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে টাইকো ক্যাসিয়োপিয়া রাশিতে একটি নবাগত জ্যোতিষ্ক দেখতে পান। তিনি বললেন যে এটি কোন গ্রহ নয়, একটি নতুন নক্ষত্র। দু'বছর পরেই নক্ষত্রটি আবার অদৃশ্য হ'য়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে টাইকো নবনক্ষত্র বা নোভা পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু এই নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা বোঝাতে টাইকো পারলেন না। যীশু যখন ক্রুশবিদ্ধ হন তখন নাকি সূর্য্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও সূর্য্যালোক স্তিমিত হ'য়ে মেদিনীকে ম্লান করে দিয়েছিল। টাইকো তাঁর পর্য্যবেক্ষণকে এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে এ এক অপূর্ব ঐশ্বরিকলীলা।

এ পর্য্যন্ত আমরা টাইকো ব্রাহীর ব্যর্থতাগুলির কথাই আলোচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে জটিল গাণিতিক হিসাবপত্রে, দর্শনশাস্ত্রে ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের চিন্তনে টাইকো খুব কাঁচা ছিলেন। বিশ্বের চিন্তাজগতে তাঁর দান খুবই নগন্য। অবশ্য একথা বুঝতে হবে যে টাইকোর উল্লিখিত মত ও আবিষ্কার তাঁর নিজের মনে যে ভাবেরই জন্ম দিক না কেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তার তাৎপর্য্য ধরতে পেরেছিলেন। কোপারনিকানবাদের জাতশত্রু হওয়া সত্বেও টাইকো স্বীকার করেছিলেন যে গ্রহেরা সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। নবনক্ষত্রের আবিষ্কার অ্যারিষ্টটলের অপরিবর্তনশীল নক্ষত্রলোকের ধারণাকে চূর্ণ বিচূর্ণ

করে দিচ্ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণা দেখা দিচ্ছিল যে পরিবর্তনই সৃষ্টির অন্তরের সত্য। এ পরিবর্তন থেকে সুদূর নক্ষত্র-লোকেরও রেহাই নেই।

অবশ্য এই কারণে আর টাইকোর নাম জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়নি। তাঁর ঐতিহাসিক খ্যাতির কারণ তাঁর দুর্লভ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে টাইকো সকল যুগের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যবেক্ষক ছিলেন। তখন দূরবীণ ছিলনা, আলোকচিত্র বা বর্ণালীচিত্রগ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিলনা। যা কিছু সামান্য যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলিকেই উন্নত করে খালি চোখে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান টাইকো যে নিপুণতার সঙ্গে নির্ণয় করেছিলেন তা সত্যই অতুলনীয়।

আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় কিছু মাপতে হ'লে একবার মেপে সন্তুষ্ট হই না। আমরা জানি যে ব্যক্তিগত ভুলের জন্য একবারের মাপ, প্রকৃত মাপের কম বা বেশী হ'তে পারে। তাই আমরা বহুবার পর্য্যবেক্ষণ করি। এই ফলগুলির মধ্যে যেগুলির ভেতরে গুরুতর পার্থক্য নেই, যেগুলি প্রায় একই, তাদের গড়কে আমরা শেষ চূড়ান্ত মাপ বলে গ্রহণ করি। এই বিজ্ঞানসম্মত গড় গ্রহণের পদ্ধতিও টাইকোই প্রথম প্রয়োগ করেন।

লোহিতাভ গ্রহ মঙ্গলের অবস্থান ও গতি টাইকোব্রাহী অসীম যত্ন ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে নির্ণয় করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এই পর্বতপ্রমাণ তথ্যের সাহায্যে কোপারনিকাসের মতবাদকে ভুল প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু বিশ্বসত্য পর্য্যবেক্ষকের ইচ্ছার অধীন নয়। টাইকো সারাজীবন কোপারনিকাসের সৌর-কেন্দ্রিক ধারণাকে ভুল বলে ঘোষণা করে গেলেন। অথচ তাঁর সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যেই একদিন টলেমীবাদ কবরস্থ হ'ল, কোপার-নিকানবাদের মূল তথ্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হ'ল। এ কাজ

যিনি করেছিলেন সেই জার্মান জ্যোতির্বিদের নাম জন কেপলার। কেপলারকে আবিষ্কার করাও টাইকোর সঠিক পর্য্যবেক্ষণ শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যুর পর টাইকোর বৃত্তি খুব কমে যায়। নিজের রুক্ষ মেজাজের জন্য টাইকো অনেকের সঙ্গেই সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে পারেননি। দিন তাঁর বেশ কষ্টেই কাটতে লাগল। এইভাবে তিন বছর থাকার পরে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর মানমন্দির উরানিবর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ্ টাইকোকে একটি বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। একটি দুর্গকে মানমন্দির হিসেবে ব্যবহার করতে দিতেও তিনি সম্মত হন। টাইকো এই প্রস্তাব গ্রহণ করে জার্মানীতে গিয়ে কাজ সুরু করেন।

কোপারনিকাস চিন্তাবীর ছিলেন, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিলেন না। আর টাইকো অনন্যসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু মতবাদের ক্ষেত্রে বা অংকশাস্ত্রগত হিসাবপত্রে তাঁর দক্ষতা ছিলনা। তাই টাইকো একজন সাহায্যকারী খুঁজছিলেন। এই সময়ে টাইকোর স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল না। সহকারী এজন্যও জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। টাইকোর বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যে তিনজন দেখা করতে এলেন, তিনি তাদের মধ্য থেকে তরুণ জ্যোতির্বিদ্ ও অংকশাস্ত্রজ্ঞ জন কেপলারকে নির্বাচন করে নিলেন।

কেপলারের কাজে যোগদানের পরে টাইকোর সঙ্গে কিছুদিন এক নীরব সংগুপ্ত সংঘর্ষ চলেছিল। টাইকো চাইছিলেন কেপলারকে দিয়ে তাঁর মঙ্গলের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যের সাহায্যে কোপারনিকানবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করাতে। অন্যদিকে কেপলার ছিলেন কোপারনিকানবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। অথচ টাইকোকে তাঁর তা বলার উপায় ছিল না। বেশীদিন অবশ্য এই জটিল পরিস্থিতি বজায় রইলনা। ১৬০১

খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর টাইকো হঠাৎ বেশী অসুস্থ হয়ে পরেন ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

টাইকো কেপলারকে তাঁর সমস্ত নথিপত্রের উত্তরাধিকারী করে দিয়ে যান। কেপলার ঐ মানমন্দিরের অধ্যক্ষপদও লাভ করেন। টাইকো ভেবেছিলেন যে কেপলার তাঁর নথিপত্রের সাহায্যে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে শেষ করবে, কোপারনিকানবাদকে অসার বলে দেখাবে। কেপলার অবশ্য ঐ তথ্যের সাহায্যে কোপারনিকাসের মতকে সংশোধিত করেছিলেন, কিন্তু অসার বলে দেখিয়ে গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেননি। টলেমীর মতবাদের দিকে পশ্চাদপসরণ বিজ্ঞানের পক্ষে আর সম্ভব ছিলনা। বিজ্ঞান যুগে যুগে সত্য থেকে অধিকতর সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সত্য সাম্প্রতিক যন্ত্রপাতি ও সাম্প্রতিক সামাজিক ধারণা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। সমাজের প্রয়োজন যতই বেশী করে প্রকৃতিকে জানতে চায়, যন্ত্রপাতি যতই উন্নত হতে থাকে, ততই সাম্প্রতিক সত্যের ত্রুটি বা খুঁত ধরা পড়ে। তাই বিজ্ঞান অধিকতর নিখুঁত সত্যের অভিমুখে ধাবিত হয়। এই কারণেই আজকের যা আপেক্ষিক সত্য, কাল তা অসত্য হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান ক্রমেই স্থিরলক্ষ্য হয়ে পরমসত্যের দিকে অগ্রসর হয়। তাই তো আমরা চিরদিন বলে এসেছি ও চিরদিন বলতে থাকবো উপনিষদের বিখ্যাত বাণী—

অসতো মা সদ্গময়।

[পাঁচ]

জন কেপলার

জন কেপলারের জন্ম হয়েছিল ষ্টাট্‌গার্টের নিকটবর্তী ভিল সহরে। সময়টা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর। তাঁর পিতা বার্নস্‌উইকের ডিউকের অধীনে সামান্য চাকরী করতেন। ধর্মমতে তিনি ছিলেন প্রোটেষ্টাণ্ট।



জন কেপলার

ছোটবেলায় কেপলারের বসন্ত হয় ও তাতেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। হাত দুটো এতে বড়ই দুর্বল হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিও হয়ে যায় ক্ষীণ। তবু পিতার আর্থিক দুরবস্থার জন্য তিনি কিছুদিন সরাইখানায় চাকরের কাজ করতে বাধ্য হন।

পরে তাঁর মেধার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠায় তাকে ধর্মযাজক হিসেবে শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনকার দিনে ধর্মযাজনাই শ্রেষ্ঠ পেশা বলে বিবেচিত হ'ত।

মল্‌ব্রাউন স্কুলের পড়া শেষ করে কেপলার তুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তুবিনজেনের অংকশাস্ত্রের অধ্যাপক মাইকেল ম্যাষ্টলীন ছিলেন কোপারনিকানবাদী। তিনি তাঁর ছাত্র কেপলারকে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদে বিশ্বাসী করে তোলেন।

১৫৯৪তে কেপলার স্নাতক উপাধি পান। এর পরে কথা ছিল তাঁর ধর্মযাজকের কাজে যোগ দেওয়া। কিন্তু তাতে তাঁর মন ছিল না। বিশ্বরহস্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। যুগচিন্তা এমন একজন উদ্গাতা খুঁজে বেড়াচ্ছিল যিনি কোপারনিকানবাদের কেন্দ্রীয় ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই মতবাদের সংস্কার সাধন করবেন, মানুষের বিশ্বজ্ঞানকে পরম সত্যের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেবেন। কেপলার যাজকবৃত্তি অবলম্বন না করে অধ্যাপকের পেশা গ্রহণ করলেন।

নবনক্ষত্রের আবিষ্কার স্থির, অপরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের ধারণায় প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার আকাশে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হ'ল। পর্য্যবেক্ষণের ফলে বোঝা গেল যে ধূমকেতু বহুদূর থেকে আসে। অ্যারিষ্টটলীয় ধারণায় প্রত্যেক গ্রহের, চন্দ্রের, সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের পৃথক পৃথক স্ফটিক গোলক ছিল। ধূমকেতুর আবির্ভাব স্পষ্ট করে দেখাল যে এই পুচ্ছবিশিষ্ট জ্যোতিষ্কটির গতিপথ ঐ অভেদ্য স্ফটিক গোলককে ভেদ করেই প্রসারিত। তাই এই আবিষ্কারের ফলে স্ফটিক গোলকের ধারণা বজায় রাখাই কঠিন হয়ে উঠল। রক্ষণশীল টাইকো পর্য্যন্ত স্ফটিক গোলকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। দর্শনের জগতে, মতবাদের ক্ষেত্রে, জিওরদানো ব্রুনোর ধারণা টলেমী-অ্যারিষ্টটল কল্পিত বিশ্বচিত্রের ভিত্তিতে আঘাত করছিল। জ্যোতির্বিদ্যার সব ধারণাই এই সময়ে এক ওলটপালটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

বিশেষ করে ষষ্ঠদশ শতকের শেষভাগে সকলেই অনুভব করছিলেন যে টলেমীর মতবাদ ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোপারনিকাসের তত্ত্বও সকল ঘটনার সুসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারছিল না। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ম্যাগিনি লিখলেন যে নতুন তৃতীয় মতবাদ চাই! ম্যাষ্টলীন লিখলেন যে আরও পর্য্যবেক্ষণ চাই, তথ্য চাই। তবেই নতুন মত গঠিত হবে। টাইকো ব্রাহী যুগের

এই আহ্বানে সাড়া দিয়েই তথ্যসংগ্রহে জীবনপাত করেছিলেন। কেপলারও সর্বদা নতুন বিশ্বচিত্র গড়ে তোলার কথা ভাবতেন।

২৪ বছর বয়সে কেপলার একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ তিনি কোপারনিকানবাদকে সমর্থন করলেন। কেপলারও পিথাগোরাসবাদীদের মত বিশ্বাস করতেন যে স্রষ্টা সৃষ্টিকে সহজ ও সুন্দর গাণিতিক নিয়মে সাজিয়ে রেখেছেন। তাই প্লেটোর মত তিনি বিভিন্ন গ্রহের কক্ষব্যাসের মধ্যে সহজ সম্পর্ক বার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একাজে তিনি সফল হননি। তারপরে তিনি নানারকম জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে বিশ্বপরিকল্পনা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ চিত্র জ্যোতির্বিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলনা। ইতালীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি কেবল বললেন যে লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি আছে। টাইকেব্রাহী লিখলেন যে আগে তথ্যসংগ্রহে মন দিয়ে, তারপর এ সব পরিকল্পনার কথা ভাবতে বসা উচিত।

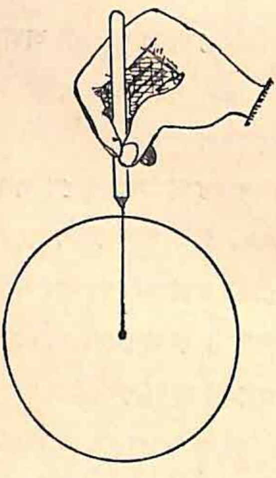
টাইকো কিন্তু বইখানা পড়ে একথা বুঝেছিলেন যে কেপলার অংকশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। অন্যদিকে কেপলারও বুঝেছিলেন যে নতুন বিশ্বচিত্র গঠন করতে হলে নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন খুব বেশী। তথ্যের দাবি যিনি তোলেন সেই অধ্যাপক ম্যাষ্টলীনের ছাত্র ছিলেন কেপলার। এই সব কারণেই টাইকো ও কেপলারের ঐতিহাসিক সংযোগ ঘটেছিল।

টাইকো মঙ্গলের অবস্থান সম্বন্ধে যে পর্বতপ্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য রেখে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কেপলারের গণিতপ্রতিভা সংযুক্ত হ'ল। প্রথমে তিনি চেষ্টা করলেন কোপারনিকাসের পদ্ধতির হিসেবের সঙ্গে মঙ্গলের প্রকৃত অবস্থান মেলাতে। সঠিক মিল হল না। হিসাবগত অবস্থান ও প্রকৃতঅবস্থানের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব সবচেয়ে বেশী হল ৮ সেকেণ্ডের। তথ্যগত হিসাব ও প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে ১০ মিনিট গরমিল হলেও কোপারনিকাস তাকে কোন গুরুত্ব দিতেন না। ৮

সেকেণ্ড ১০ মিনিটের ৭৫ ভাগের এক ভাগ। কেপলার কিন্তু এটুকু মিলে খুশী হতে পারলেন না। তার এক কারণ এই যে টাইকোর পর্য্যবেক্ষণের ওপরে তার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল। তা ছাড়া সমসাময়িক বিজ্ঞানীরাও কোপারনিকানবাদকে পর্য্যাপ্ত মনে করছিলেন না, নতুন মতবাদের জন্য বৈজ্ঞানিক বিকাশের ধারা ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল।

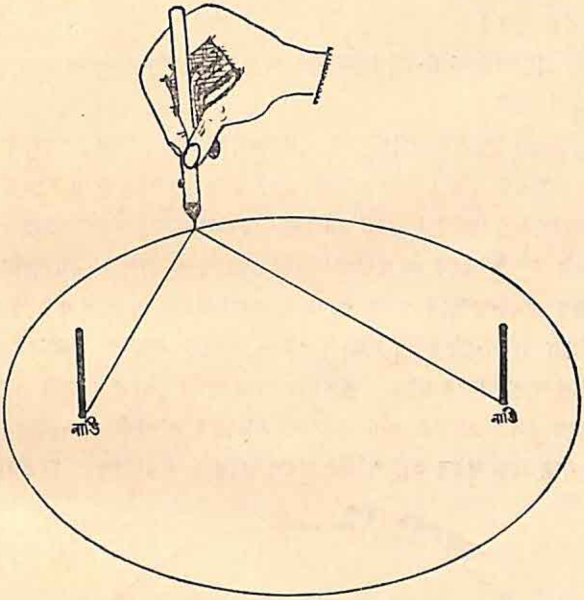
১০৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশের আরজাচেল বলেছিলেন যে গ্রহেরা হয়ত বৃত্তপথে ঘোরেনা, ডিম্বরেখাকার উপবৃত্তপথে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সে কথায় তখন কেউ কর্ণপাত করেনি। অ্যারিষ্টটলীয় ধারণায় বৃত্ত-গতিই ছিল বিশ্বের স্বাভাবিকগতি। কেপলারের যুগে জ্যোতির্বিদ্যার সব পুরোনো ধারণাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। বৃত্তগতিকে আর একমাত্র অপরিহার্য্য রূপ বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল না। তাই কেপলার বৃত্তগতির ধারণাকে অতিক্রম করে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কল্পনা করতে পারলেন।

বৃত্তপথ হ'ল এমন পথ যার যে কোন বিন্দু থেকে কেন্দ্রবিন্দুর দূরত্ব ধ্রুব বা এক হয়। একটা পিন কোথাও পুঁতে দিয়ে একটা সুতোর এক প্রান্ত তাতে বাঁধা হ'ল। অন্য প্রান্তে একটা পেন্সিল বেঁধে সুতোটা টান রেখে পেন্সিলটা ঘোরালে একটি বৃত্ত আঁকা হয়। আর উপবৃত্ত



বৃত্ত অঙ্কন

হ'ল এমন পথ যার কোন বিন্দু থেকে ঐ উপবৃত্তের নাভিদ্বয়ের দূরত্বের যোগফল ধ্রুব বা এক হয়। উপবৃত্ত আঁকা যায় দু'টো পিন পুতে। এক টুক্‌রো সুতোর দুই প্রান্ত এইদুই পিনে বাঁধা হয়। এবার পেন্সিলটা সুতোর কোথাও লাগিয়ে সুতো টান রেখে পেন্সিল ঘোরালেই উপবৃত্ত আঁকা হয়। দুটি বিন্দুতে পিন পোঁতা হয়, তাদেরই বলে উপবৃত্তের



উপবৃত্ত অঙ্কন

নাভি। দুই নাভি থেকে উপবৃত্তর কোন বিন্দুর দূরত্ব স্বভাবতই সুতোর মোট দৈর্ঘ্যের সমান হ'বে, অর্থাৎ ধ্রুব হবে।

কেপলার দেখলেন মঙ্গলগ্রহ সূর্য্যকে এক নাভিতে রেখে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে করে নিলে তত্ত্বগত হিসাব ও টাইকোর পর্য্যবেক্ষণগত হিসাব পুরোপুরি মিলে যায়, মঙ্গলের অবস্থান সম্বন্ধে তত্ত্ব ও প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আর কোন গরমিল থাকেনা।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে কেপলার তার 'এ্যাষ্ট্রনমিয়া নোভা' গ্রন্থে মঙ্গলের গতি সম্বন্ধে দু'টি সূত্র উপস্থিত করলেন।

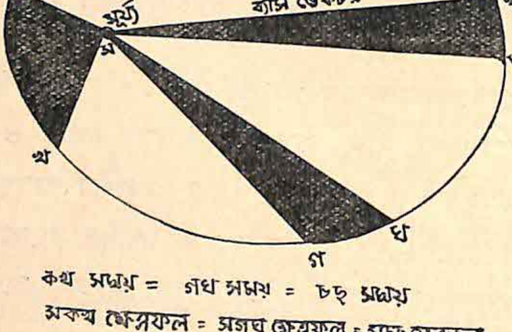
(১) মঙ্গলগ্রহ সূর্য্যকে এক নাভিতে রেখে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়ায়।

(২) মঙ্গলের কক্ষপথের ব্যাস-ভেক্টর সমান সমান সময়ে সমান সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দে 'এপিটোম্ এ্যাষ্ট্রোনমিয়া কোপারনিকা' গ্রন্থে তিনি উপরোক্ত সূত্রদু'টিকে সকল গ্রহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করলেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে 'হারমনিকস্ মুন্ ডি' গ্রন্থে তিনি তৃতীয় সূত্রটি উপস্থিত করলেন।

(৩) গ্রহদের কক্ষ-আবর্তন কালের বর্গ সূর্য্য থেকে দূরত্বের ঘনর সঙ্গে আনুপাতিক।

এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে কেপলার গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন। প্রথম সূত্র থেকে বোঝা গেল যে সূর্য্য থেকে গ্রহের দূরত্ব সারা বছর ধরে বদলায়। নিকটতম অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর। আর দূরতম অবস্থানকে অপসূর। দ্বিতীয় সূত্র দেখাল যে সূর্য্য থেকে গ্রহের দূরত্ব কমলে তার গতি বাড়বে, দূরত্ব বাড়লে গতি কমবে। কারণ তা না হ'লে ব্যাস-ভেক্টর্ সমান সমান সময়ে সমান সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করতে পারে না। তৃতীয় সূত্র সূর্য্য থেকে কোন গ্রহের গড় দূরত্বের সঙ্গে সেই গ্রহের এক বছরের সময়ের সম্পর্ক দেখাল। পৃথিবী থেকে সূর্য্যের গড় দূরত্ব যা, শনির দূরত্ব তার ৯.৫৪ গুণ। সুতরাং শনির



কখ সময় = গঘ সময় = চছ সময়
সকখ ক্ষেত্রফল = সগঘ ক্ষেত্রফল = সচছ ক্ষেত্রফল

দূরত্বের ঘন, পৃথিবীর দূরত্বের ঘনর ৮৬৮·৩ গুণ (=৯·৫৪ × ৯·৫৪ × ৯·৫৪)। ৮৬৮·৩ এর বর্গমূল ২৯½। অতএব শনির বছর পৃথিবীর বছরের ২৯½ গুণ। এর মানে হ'ল এই যে শনির সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগবে ২৯½ পার্থিব বছর।

কেপলারের সূত্রগুলি কোপারনিকানবাদের কেন্দ্রীয় ধারণাকে সুসম্পূর্ণ করে তুলল। বৃত্তকে উপবৃত্ত করার ফলে এপিসাইকেলের ধারণা বর্জন করা সম্ভব হ'ল। তত্ত্বের সঙ্গে তৎকালীন পর্য্যবেক্ষণের কোন বিরোধ রইল না।

পরবর্তী কালে, কেপলারের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু'শো বছর পরে উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখা গিয়েছিল যে গ্রহেরা কেপলারের সূত্রগুলি কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলেনা, কিছু কিছু বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু কেপলারের সময়ে এ প্রশ্ন ওঠেনি। তখন যে প্রশ্ন উঠেছিল তা হ'ল উপবৃত্তগতির কারণ নিয়ে। প্রাচীনপন্থীরা বলতেন যে স্ফটিকগোলক বিশ্বে স্থাপিত হলে তা স্বাভাবিক নিয়মেই আবর্তনশীল হয়ে ওঠে বা দেবদূতেরা সেগুলি ঘোরায়। নববিজ্ঞান স্ফটিকগোলককে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করল, বৃত্তের সিংহাসনে উপবৃত্তকে বসাল! তাই স্বতই প্রশ্ন উঠল যে গ্রহেরা উপবৃত্তপথে কেন ঘোরে?

কেপলার নিজেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে গ্রহদের গড় দূরত্বগুলি বাদ্যযন্ত্রের তারের মত সঙ্গীতস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরো লেখেন যে সূর্য্য থেকে শুঁড়ের মত শক্তিরশ্মি বেরিয়ে গ্রহকে ঠেলে। সূর্য্য ঘোরে বলে গ্রহেরাও এই শক্তিরশ্মির ঠেলায় ঘুরে বেড়ায়। শক্তিরশ্মিগুলিকে সাইকেলের স্পোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ-যোগ্য যে সূর্য্য যে তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরে তা তখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কেপলারের এই অস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বৃত্ত ও উপবৃত্তর মধ্যে উপবৃত্তকে নেওয়ার কোন কারণই পাওয়া গেলনা।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে গিলবার্ট চুম্বক সম্বন্ধে তার বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ব্রুনোর বিশ্বচিত্র গ্রহণ করে লিখেছিলেন যে সূর্য্য ওগ্রহদের চুম্বকধর্মী গোলক মনে করলে তাদের আকর্ষণ বিকর্ষণের সাহায্যে গ্রহগতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কেপলার এই ধারণার সাহায্যেও উপবৃত্তপথের কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হ'তে পারেন নি।

পৃথিবী যে নিকটবর্তী বস্তুসমূহকে আকর্ষণ করে একথা কেপলার বুঝেছিলেন। তিনি লেখেন—

'প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীকে খুঁজে বেড়ায় না বলে, পৃথিবী প্রস্তরখণ্ডকে টেনে নেয় বলাই সঙ্গত।'

কেপলার একথাও লিখেছিলেন যে মহাশূন্যে অবস্থিত দুটি প্রস্তর-খণ্ড পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে তাদের সাধারণ ভরকেন্দ্রে মিলিত হ'বে। গিল্‌বার্ট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বলতেন যে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা চন্দ্রের আকর্ষণের ফল। কেপলারও এই মতই প্রচার করতেন।

চুম্বক যেমন চুম্বকায়নের যোগ্য পদার্থকে বা বিপরীতধর্মী চুম্বক-প্রান্তকে আকর্ষণ করে, বিশ্বে অনুরূপ কোন আকর্ষণ বর্তমান একথা কেপলার বুঝেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে এই আকর্ষণের বল দূরত্বের বর্গের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতসম্পন্ন হবে। অর্থাৎ দূরত্ব ৪ গুণ হলে বল অর্ধেক হয়ে যাবে, ইত্যাদি। পরে অবশ্য তিনি আবার বলেন যে আকর্ষণ বল দূরত্বের সঙ্গে বিপরীত অনুপাত সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ দূরত্ব ৪ গুণ হ'লে বল চারভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। ফরাসী জ্যোতির্বিদ বাউইল্‌লড্ এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে দূরত্বের বর্গের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতের ধারণাই সঠিক। এই আকর্ষণের সঠিক রূপ অবশ্য কেপলার ধরতে পারেননি ও এই পারস্পরিক আকর্ষণই যে সৌরজ্যোতিষ্কদের গতির সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে

পারে তাও তার ধারণায় ছিল না। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কেপলার শুধু গ্রহগতির সঠিক সূত্রই আবিষ্কার করেননি, মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ভিত্তিও প্রস্তুত করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

দূরবীণের উন্নতিতেও কেপলারের অবদান উল্লেখযোগ্য। সৌর-কলঙ্কও কেপলারের নজর এড়ায়নি। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন যে শুক্রগ্রহ সূর্য্যের 'থালা' অতিক্রম করে যাওয়ার জন্যই সূর্য্যে কলঙ্ক দেখা যায়।

আলোকশাস্ত্র সম্বন্ধেও কেপলার দু'খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি দৃষ্টির যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে কোন বস্তু থেকে আলোকরশ্মি চোখে এলেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। তা ছাড়া চোখের কয়েকটি সাধারণ রোগের সঠিক কারণও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। কোন বস্তুর দূরত্ব আমরা কেমন করে বুঝি? ঐ বস্তু থেকে আমাদের দুচোখ পর্য্যন্ত দুটি রেখা টানলে, তাদের মধ্যে একটি কোণ উৎপন্ন হয়। আমাদের দু'চোখের মধ্যকার দূরত্ব ও এই কোণটি জানা থাকলে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে এই সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সব বাহু ও কোণের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কেপলারই প্রথম দেখান যে আমরা মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ ত্রিকোণমিতির অংকটি কষে ফেলে বস্তুটির দূরত্ব নির্ণয় করি।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর জন কেপলারের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। বলা হয় যে টাইকোর বিশৃঙ্খল তথ্যসমুদ্রে কেপলার শৃঙ্খলা এনেছিলেন। কিন্তু কেপলারের তিনটি সরল সূত্রের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে কী অমানুষিক পরিশ্রম কেপলারকে করতে হয়েছিল, ভগ্নস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও প্রতিকূল তথ্যের বিরুদ্ধে তাকে কতখানি লড়তে হয়েছিল। আজকাল তো স্কুলের ছেলেরাও 'লগ্-টেব্‌লে'র সাহায্য নিয়ে সহজে হিসাবপত্র করতে পারে। কেপলার কিন্তু এসবের সাহায্য পাননি। তাই প্রতিভার কথা বাদ দিলেও নিছক

পরিশ্রম কেপলার যতটা করেছিলেন কেবলমাত্র সেইজন্যও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহসে প্রসিদ্ধিলাভ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

কেপলার যখন জার্ম্মানীতে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইতালীর আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি হলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। বয়সে তিনি কেপলারের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন। কেপলার ও গ্যালিলিও উভয়েই ছিলেন কোপারনিকানবাদী এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ছয়

গ্যালিলিও গ্যালিলি

ইতালীর পিসা সহরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্ম হয়। পিসা ছিল ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। তখন গ্যালিলিওর পরিবারের খুবই নাম ডাক ছিল। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের পতনের পর এদের খুবই দৈন্যদশা সুরু হয়। গ্যালিলিওর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র সঙ্গীতজ্ঞ। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে গ্যালিলিও পশমের ব্যবসা করবেন। পরে ছেলের মেধার পরিচয় পেয়ে তাকে ডাক্তারী পড়ান স্থির হয়।



কোন এক মঠে সাহিত্য ও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা শেষ করে গ্যালিলিও ডাক্তারী পড়ার জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন ডাক্তারী পড়ার পরেই তিনি পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মন দেন।

মানুষ যেখানে প্রকৃতির সম্পদকে আপন কাজে লাগাবার জন্য শ্রম করে, নানা যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও অন্যান্য উপকরণ তৈরী করে, সেই স্থানগুলিই বিজ্ঞানের প্রকৃত জন্মস্থান, উৎসস্থল। প্রকৃতির বস্তুগুলিকে বদলাতে গিয়েই মানুষ প্রাকৃতিক সত্যের সন্ধান পায়। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ঐ সব উৎস থেকেই ধারণা পান ও আপন মণীষার সাহায্যে তত্ত্বগত সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাত্ত্বিক সত্য আবার ব্যবহারিক শ্রমক্রিয়াকে উন্নত করে, অগ্রসর করিয়ে দেয়।

পদার্থ বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় গ্যালিলিওর অবদান অতুলনীয়। কিন্তু সমসাময়িক কালে যে সব চিন্তাভাবনা য়ুরোপে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইতালীর দক্ষ শ্রমিকেরা ব্যবহারিক কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলেন, গ্যালিলিও গ্যালিলি সেই সব চিন্তা, অভিজ্ঞতারই ফল। প্রতিভাসম্পন্ন বলেই তিনি যুগচিন্তার সঠিক রূপটি ধরতে পেরেছিলেন, সেগুলিকে সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিকাশ লাভ করাতে পেরেছিলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হতে পেরেছিলেন। গ্যালিলিওর রচনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের এই সত্যটি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। 'দুইটি নতুন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

স্যালভিয়াটি ঃ ভিনিশের অস্ত্রকারখানায় দিনরাত যে কাজ চলছে তা দেখলে বুদ্ধিমান পর্য্যবেক্ষক গবেষণার একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র খুঁজে পাবেন। কারিগরেরা সর্বদাই যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা তৈরি করে চলেছেন। এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা পিতৃপিতামহের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও নিজস্ব পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে ঘটনাবলীর চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

স্যাগ্রিডো ঃ ঠিকই বলেছ। এ ব্যাপারে আমারও খুব আগ্রহ আছে। আমি প্রায়ই সেখানে গিয়ে ভাল কারিগরদের কাজ দেখি। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমি অনেক গবেষণার বিষয় খুঁজে পেয়েছি। যা সহজে নজরে পড়ে এমন অনেক তথ্য তারা আমাকে জানিয়েছেন। আবার এমন অনেক ঘটনার কথাও বলেছেন যা নিতান্তই অভিনব ও অবিশ্বাস্য।

গ্যালিলিও একথাও লিখে গেছেন যে জাহাজী কারিগর ও স্থপতিদের কাছ থেকে তিনি পদার্থের সহনশীলতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। জল তোলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'একটা পাম্প দিয়ে জল তোলা যাচ্ছিল না। আমি ভাবলাম

পাম্পটা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি। সারাবার জন্য মিস্ত্রী ডাকলাম। মিস্ত্রী কিন্তু বলল যে পাম্প ঠিকই আছে। তবে তলার জল খুব নীচে নেমে গেছে বলে জল উঠছে না। সে হলফ করে বলল যে কোন যন্ত্র দিয়েই জলকে ১৮ হাতের এক ইঞ্চি বেশী ওপরে ওঠান যাবে না।'

এই অশিক্ষিত মিস্ত্রীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গ্যালিলিও দেখান যে 'কোন জলের স্তম্ভই ২৪ ফুটের বেশী উঁচু হয়ে স্থির থাকতে পারে না', 'আপন ভরে ভেঙ্গে পড়ে যায়'। এখন অবশ্য আমরা জানি যে পাম্প জল তুলতে পারে বায়ুর চাপের অস্তিত্বের জন্য। পাইপের মুখ থেকে বাতাস বের করে নিলে বায়ুমণ্ডলের চাপে জল নীচের পাইপ ধরে উঠে আসে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ প্রায় ২৪ ফুট জলের স্তম্ভের চাপের সমান। তাই একটি পাম্পের সাহায্যে ২৪ ফুটের বেশী উঁচুতে জল তোলা সম্ভব নয়।

নিক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত কি ধরণের পথে চলে এ সম্বন্ধেও গ্যালিলিও নানা গবেষণা করেছিলেন, কয়েকটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন —

'গোলন্দাজদের কাছে আমি শুনেছিলাম যে সমান্তরালের সঙ্গে ৪৫° কোণ করে কামান বসালে, গোলা সবচেয়ে দূরে গিয়ে পৌঁছোয়।'

গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে গতিবেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণসঞ্জাত ত্বরণের যুগ্ম প্রভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তু অধিবৃত্তাকার পথে ধাবিত হয়। এই তত্ত্ব অবশ্য গোলন্দাজদের ধারণার চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক ব্যাপক। প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বই প্রথম দেখাল যে কামান বসানর কোণটা ৪৫° ডিগ্রী থেকে কয়েক ডিগ্রী কম হলে গোলাটা যত-দূর যাবে, সেই ক' ডিগ্রী বেশী হলেও সমান দূর যাবে। গোলন্দাজেরা তাদের ব্যবহারিক ধারণার সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে নি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্যালিলিওর আবিষ্কার গুনে শেষ করা যায় না। ঐ সব আবিষ্কারের মূলেই ছিল আলোকযন্ত্র দূরবীণ। দূরবীণ আবিষ্কারের কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ।

বিখ্যাত দার্শনিক রজার বেকন তাঁর রচনায় লিখেছিলেন যে এমন কোন আলোকযন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব যার সাহায্যে দূরবর্তী বস্তু কাছে, বড় করে দেখা যাবে। এ ধরণের যন্ত্রনির্মাণ সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কিছু আলোচনা করেছিলেন। ইংরেজ গণিতজ্ঞ লিওনার্ড ডিগেন্স দূরবীণ তৈরী করেছিলেন বলে এক গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যাওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হল্যাণ্ডে বই ছাপানর ব্যবসা খুব প্রসার লাভ করে। ফলে পাঠকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। বহু পাঠকের চোখের দোষ, এর ফলে ধরা পড়ে। চোখের রোগের প্রতিকার করতে গিয়েচশমা আবিষ্কৃত হয় ও চশমা তৈরীর শিল্পবিশেষ বিকাশ লাভ করে। মিডলবার্গে জ্যান্সেন ও লিপারসে নামে দু'জন দক্ষ চশমার কারিগর বাস করতেন। চশমা তৈরী করতে উত্তল, অবতল, নানা রকমের কাঁচের বা লেন্সের দরকার হয়। একাধিক কাঁচের ভেতর দিয়ে কোন বস্তুকে দেখলে কেমন দেখায় তা এই দু'জন কারিগর প্রায়ই নেড়ে চেড়ে দেখতেন।

এইভাবেই জ্যানসেন অনুবীণ ও লিপারসে দূরবীণ আবিষ্কার করলেন। ডাচ্ সরকার ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে লিপারসের কাছে একটি দূরবীণের বায়না দেন। পরে জ্যানসেন্ ও লিপারসের তৈরী যন্ত্রগুলি বাজারে বিক্রী হতে থাকে।

একথা গ্যালিলিওর কানে গেল। বাজার থেকে তিনি কোন যন্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে অবশ্য ইতিহাস নীরব। তবে খবরটা শুনে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কয়েক রাত তিনি

ঘুমোতে পারেন নি। নিজেই একটি দূরবীণ তৈরী করতে বসলেন গ্যালিলিও। এজন্য অর্থ ও পরিশ্রম কোন কিছুরই তিনি পরোয়া করেননি। কয়েকদিনের চেষ্টায় তিনি যে দূরবীণ তৈরী করলেন তার সাহায্যে দূরবর্তী বস্তুকে প্রায় ত্রিশগুণ বড় দেখাল।

লিপারসের দূরবীণ ও গ্যালিলিওর দূরবীণ ঠিক একরকমের ছিল না। আধুনিক দূরবীণ অবশ্য খুবই জটিল ও প্রধানতঃ প্রতিসরণ ও প্রতিফলন দূরবীণ নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লিপারসে ও গ্যালিলিওর দূরবীণ উভয়ই ছিল প্রতিসরণ দূরবীণ। প্রতিফলন দূরবীণ পরবর্তীকালে আইসাক্ নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন। মূলতঃ দূরবীণে একটি অস্বচ্ছ টিউবের দুইপ্রান্তে দু'খানি স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড বসান থাকে। টিউবের যেদিক দর্শনীয় বস্তুর দিকে ঘুরিয়ে ধরা হয় তাকে আমরা বস্তুপ্রান্ত বলতে পারি। অন্যদিকে চোখ রেখে বস্তুটির প্রতিচ্ছবি দেখা হয় বলে এই দিক্‌কে অক্ষিপ্রান্ত বলা চলে। লিপারসের দূরবীণে দু'দিকেই ছিল উত্তল কাঁচখণ্ড। বস্তুপ্রান্তের কাঁচটির নাভিদৈর্ঘ্য ছিল খুব বেশী আর অক্ষিপ্রান্তের কাঁচটির নাভিদৈর্ঘ্য যথাসম্ভব কম। দু'টি কাঁচের মধ্যের দূরত্ব ছিল দুই নাভিদৈর্ঘ্যের যোগফলের সমান। গ্যালিলিওর দূরবীণে অক্ষিপ্রান্তের কাঁচখণ্ডটি ছিল অবতল ও টিউব-দৈর্ঘ্য ছিল দু'টি কাঁচখণ্ডের নাভিদৈর্ঘ্যের অন্তরফলের সমান। লিপারসের দূরবীণে শেষ প্রতিচ্ছবিটি বস্তুর উল্টোরূপ দেখাল। গ্যালিলিওর দূরবীণে শেষ প্রতিচ্ছবিটি বস্তুর সোজারূপ দেখাল। অবশ্য জ্যোতির্বিদ্যায় এই পার্থক্যের কোনই গুরুত্ব নেই।

দূরবীণ আবিষ্কারের কাহিনী থেকে আমরা দেখি যে বিজ্ঞানী সমাজের ব্যবহারিক ক্রিয়া ও যুগচিন্তার ওপর খুবই নির্ভরশীল। সামাজিক কারণে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনিবার্য্য হয়ে উঠলে তা কোন বিশেষ প্রতিভাশীল বিজ্ঞানীর জন্য অপেক্ষাও করে না, অন্য কেউ তা আবিষ্কার করে ফেলেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল বলে কীর্তিত হয়ে থাকেন। সত্যিই কত বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রতিভা প্রযুক্ত হয়েছিল তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলেছিলেন যে কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যেই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। গ্যালিলিও দা ভিঞ্চির এই পদ্ধতিকেই উন্নত ও বিকশিত করে সফলভাবে প্রয়োগ করলেন।

'পদার্থের সহনশীলতা' শাস্ত্রের জন্মদাতা হলেন গ্যালিলিও। বলবিদ্যাও (স্থিতি ও গতিশাস্ত্র) তারই সৃষ্ট। তিনিই প্রথম বলেন যে বাইরের কোন বল বস্তুর ওপর প্রযুক্ত না হ'লে নিশ্চল বস্তু নিশ্চলই থাকে আর চলমান বস্তু অপরিবর্তিত গতিতে সরলরৈখিক পথে অনন্তকাল চলতে থাকে। এই সত্যকে তিনি বস্তুর প্রকৃতিগত গুণ বলে ঘোষণা করেন। প্রযুক্ত বলের পরিমাণের সঙ্গে যে গতিপ্রাপ্ত বস্তুর ভর ও গতিবেগের গুণফল বা ভরবেগ আনুপাতিক হয় এ তথ্যও গ্যালিলিওই আবিষ্কার করেন। এই দু'টি সূত্রই পরে নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় গতিসূত্র বলে পরিচিত হয়। গ্যালিলিও বলতেন যে গতির কারণ নির্ণয় করা তার গবেষণার লক্ষ্য নয় ,তিনি বস্তু ও গতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে চান। এই পদ্ধতিই গ্যালিলিওকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। অ্যারিষ্টটল বলতেন যে এক অবিচলিত স্থির চালকের (ঈশ্বরের) শক্তিতে বস্তুসমূহ গতিশীল হয়। গ্যালিলিও দেখালেন যে বস্তু ও গতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই গতি ও স্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

পিসায় একটা উঁচু মিনার তৈরী করা করা হয়েছিল। ভিতটা বসে যাওয়ার মিনারটা একদিকে হেলে পড়ে ও এই অবস্থায়ই টিঁকে যায়। এই মিনারের ওপর থেকে একটা ভারী ও আর একটা হালকা বল একই সময়ে ফেলে্ দিয়ে গ্যালিলিও দেখান যে তারা প্রায় একই সময় পরে মাটিতে পৌঁছোয়। ষ্টেভিনাস বহুদিন র্ব্ব এই পপূরীক্ষা

করেছিলেন, কিন্তু সফল হ'তে পারেন নি। আর সে পরীক্ষার কথা লোকে ভুলেও গিয়েছিল।

গ্যালিলিওই প্রথম দেখান যে পতনশীল বস্তুর গতিবেগ পতন-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আনুপাতিক। পতনদৈর্ঘ্য সময়ের সঙ্গে আনুপাতিক ভেবে তিনি অনেক পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সে রকম আংকিক সম্বন্ধ স্থাপিত করতে পারেন নি। পরে নিউটন দেখান যে পতনদৈর্ঘ্য সময়ের বর্গের সঙ্গে আনুপাতিক হয়।

গ্যালিলিওর সময়ে কোন যান্ত্রিক ঘড়ি ছিল না। বস্তুর পতন সংক্রান্ত পরীক্ষায় তিনি জলঘড়ি ব্যবহার করেছিলেন। পিসায় থাকার সময়ে একদিন তিনি একটি বাতিদানকে দুলতে দেখেন। লক্ষ্য করে তিনি বুঝলেন যে দোলনকোণ ধীরে ধীরে কমা সত্ত্বেও দোলন-কাল একই থেকে যাচ্ছে। এই সম্পর্ককেই দোলকের সমসময় সূত্র বলা হয়। এই পর্য্যবেক্ষণের সময় গ্যালিলিও হাতের নাড়ীর স্পন্দন গুনে সময় ঠিক করেছিলেন। এই ঘটনার পরই দোলকের সাহায্যে ঘড়ি তৈরী করার বিষয়ে গ্যালিলিও চিন্তা করতে সুরু করেন। তার মৃত্যুর দশ বছর পরে তার পুত্র, পিতার নক্সামত একটি দোলকসমন্বিত ঘড়ি তৈরী করেন।

ভারকেন্দ্র সম্বন্ধেও গ্যালিলিও মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন। আনুপাতিক দিক্‌দর্শনযন্ত্রও তাঁরই আবিষ্কৃত। যুদ্ধের যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও দূর্গাদিস্থাপনের নিয়মাবলী নির্ণয়ে গ্যালিলিও সুদক্ষ ছিলেন। মতুয়ার ডিউক ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তাকে সামরিক ইন্‌জিনীয়ারের পদ দিতে চেয়েছিলেন। দূরবীণ আবিষ্কারের পর গ্যালিলিও লেখেন—

এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শত্রুকে আগেভাগেই দেখে ফেলা যাবে। তারা আমাদের দেখতে পাওয়ার আগেই আমরা তাদের দেখে ফেলতে ও তাদের শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারব। তাই আগেই আমরা স্থির করতে পারব যে তাদের তাড়া করব, না তাদের সঙ্গে

দাঁড়িয়ে লড়ব, না আমরাই পালিয়ে যাব!...আবার আক্রমণ করতে গিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা শত্রুপক্ষের বাড়ী ঘরদোর ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দূর থেকে দেখতে পাব।

বাৎসরিক ১৩ পাউণ্ড বেতনে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকুরী নিয়েছিলেন গ্যালিলিও। বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র। কিন্তু ঐ টাকায় কিছুতেই চলত না বলে তিনি চেষ্টাচরিত্র করে পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক ৩২ পাউণ্ড বেতনে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের চাকুরী সংগ্রহ করেন। পদুয়া ছিল ভিনিসের প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। এখানে ব্যবসায়ীদেরই আধিপত্য ছিল। গ্যালিলিওর অধিকাংশ গবেষণা এখানেই পুষ্পিত হয়ে ওঠে। তাঁর সামরিক জ্ঞানও প্রজাতন্ত্রকে নানাভাবে উপকৃত করে।

প্রথম থেকেই গ্যালিলিও কোপারনিকানবাদী ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে কেপলার তাঁর লেখা একখানা বই গ্যালিলিওর কাছে পাঠান। তার জবাবে গ্যালিলিও একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে আছে—

"বহুদিন আগেই আমি কোপারনিকাসের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। আমি দেখেছি যে এর সাহায্যেই ঘটনাবলীর সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, বিরোধী মতগুলি দিয়ে তা হয় না। এ সম্বন্ধে আমি অনেক যুক্তিপ্রমাণ তৈরী করেছি, কিন্তু প্রকাশ করার সাহস পাইনি। জগতে মূর্খের সংখ্যা এত বেশী যে অধিকাংশ লোকই গুরু কোপারনিকাসকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, খুব কম লোকেই তাঁর অমর কীর্ত্তিকে অনুধাবন করতে পারে। আমি কিছু লিখলে হয়ত আমাকেও লোকে ঐ রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে।"

উত্তরে কেপলার ঐ সব যুক্তিপ্রমাণ জার্মানীতে প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গ্যালিলিও অবশ্য এ ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখাননি।

দূরবীণ আবিষ্কার হয়ত গ্যালিলিও প্রথম করেন নি। কিন্তু দূরবীণকে আকাশের দিকে ঘুরিয়ে ধরার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গ্যালিলিওর প্রাপ্য। এই ঘটনার পরই তিনি পডুয়ার চাকুরীতে পাকা হন ও তাঁর বাৎসরিক বেতন হাজার ফ্লোরিন ধার্য হয়।

গ্যালিলিওর দূরবীনের কাছে আকাশ তার কত না রহস্য উদ্‌ঘাটিত করল! অ্যারিষ্টটল বলতেন যে চাঁদ একটি নিখুঁত গোলক। গ্যালিলিও দেখালেন যে চাঁদের ভূপ্রকৃতি পৃথিবীরই অনুরূপ বন্ধুর, পাহাড় পর্ব্বত সমতলভূমি ও অবতলগর্তে পূর্ণ। চাঁদের পাহাড়ের ছায়া দেখে তিনি সেগুলির উচ্চতা পর্য্যন্ত নির্ণয় করলেন। টলেমীর মতানুযায়ী শুক্র গ্রহের আর্ধেকটা সব সময় আলোকিত দেখান উচিত। গ্যালিলিও দেখালেন যে শুক্রেরও চাঁদের মতই কলাহ্রাস ও কলাবৃদ্ধি ঘটে। খালি চোখে ছ' হাজারের বেশী তারা আকাশে দেখা যায় না। হিপার্কাসের নক্ষত্রনক্সায় এর বেশী তারা ছিলনা। দূরবীণ দিয়ে গ্যালিলিও দেখালেন যে তারকার প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী, অগণ্য বললেই সঠিক বলা হয়। কালপুরুষের কোমরবন্ধনীতে খালি চোখে ৯টি তারা দেখতে পাওয়া যায়। গ্যালিলিও দেখালেন যে এখানে ৮০টি তারা আছে। এই রকমই আকাশপটের সর্বত্র। আকাশপটের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যে জ্যোতির্ম্ময় বন্ধনী দেখা যায় তাকে আমরা ছায়াপথ বলি। গ্যালিলিওই প্রথম দেখান যে ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তারকার সমষ্টিমাত্র। এইভাবে গ্যালিলিও আনাক্সা-গোরাস্ ডেমোক্রিটাসের ছায়াপথ সম্বন্ধীয় দার্শনিক প্রেক্ষাকে পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করলেন। ব্রুনোর অগণিত নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণাও সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল।

চীনের জ্যোতির্বিদেরা সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু লোকে সে কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই সৌরকলঙ্কের পুনরাবিষ্কার করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কেপলার সৌরকলঙ্ক

দেখেছিলেন, কিন্তু তার তাৎপর্য্য ধরতে পারেন নি। বলেছিলেন যে শুক্র সূর্যের থালা অতিক্রম করছে। গ্যালিলিও কিন্তু সৌরকলঙ্কের স্বরূপ ধরতে পারলেন। সৌরকলঙ্কের স্থান পরিবর্ত্তন দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে সূর্য্য আপন অক্ষের চারিদিকে আবর্তনশীল। প্রায় একই সময়ে ফেব্রিসিয়াস্ ও জেস্যুইট্ শীনার সৌর কলঙ্ক দেখেন বলে জানা যায়। শীনারের সঙ্গে তো গ্যালিলিওর রীতিমত ঝগড়া বেঁধে যায়। শীনার দাবী করতে থাকেন যে তিনিই সৌরকলঙ্কের আবিষ্কর্তা। এই ঝগড়ার ফলে শীনার গ্যালিলিওর মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হ'ন।

শনির বলয়ও গ্যালিলিও দেখেছিলেন, কিন্তু তার তাৎপর্য্য ধরতে পারেন নি। বৃহস্পতির দিকে দূরবীণ ফিরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে চারিটি জ্যোতিষ্ক বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে—বৃহস্পতির চারিটি চাঁদ আর কি! গ্যালিলিও নিজেই লিখেছেন—

"আমার সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার হ'ল চারিটি নতুন গ্রহ দেখতে পাওয়া।"

পতুয়াতে গ্যালিলিওর কোন অভাব ছিল না। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই তিনি পেয়েছিলেন। তবু জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে ফিরে যাওয়ার জন্য ছটফট করতেন তিনি। মেডিসিয়ার রাজসভা তাঁকে কবে আহ্বান জানাবে সেই অপেক্ষায় তিনি দিন গুনতেন। মেডিসির রাজসভায় বৃত্তিভোগী বিজ্ঞানী হিসেবে থাকার আশায় ছিলেন তিনি। তাহ'লে যথেষ্ট সময় পেয়ে গবেষণা করতে ও বই লিখতে পারবেন এই ছিল তাঁর কল্পনা।

বৃহস্পতির উপগ্রহ চারিটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'মেডিসীয় তারকা'। মেডিসিয়ার রাজসভা এমন একজন খ্যাতিমান পুরুষকে স্থান দিতে দেরী করল না। বিনা কাজে বাৎসরিক দু'শ পাউণ্ড বৃত্তি-লাভ করে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও ভিনিসের স্বাধীন গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ত্যাগ করে ফ্লোরেন্সের স্বৈরাচারী আবহাওয়ায় চলে গেলেন,

মেডিসিয়ার রাজসভার ভূষণ হ'লেন ; বললেন যে বই লিখে তিনি এই বৃত্তিভোগের ন্যায্যতা প্রমাণ করবেন।

গ্যালিলিওর আবিষ্কার কোপারনিকাস ও ব্রুনোর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। চন্দ্রের ভূপ্রকৃতি দেখাল যে সৌরমণ্ডলের জ্যোতিষ্কদের মধ্যে নানা সাদৃশ্য আছে। উপগ্রহবেষ্টিত বৃহস্পতি সৌরমণ্ডলের নমুনা হিসেবে প্রতিভাত হ'ল। ঐ উপগ্রহগুলি যেমন বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরছে, গ্রহেরাও তেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে, একথা ভাবা সহজ হয়ে উঠল। এই সব নিয়ে চারিদিকে তুমুল আলোচনার ঝড়ও উঠল।

ফ্লোরেন্সের গ্র্যাণ্ড ডাচেসের উদ্যানে কোপারনিকানবাদ আলোচনার জন্য এক সভা হয়েছিল। ক্যাষ্টেলি নামের এক বৈজ্ঞানিক এখানে কোপারনিকানবাদের স্বপক্ষে বক্তৃতা দেন। ডাচেস্ তার বক্তৃতা শুনে খুবই উৎসাহিত হন, কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে তার মত হয়ত ধর্ম্মদ্রোহিতা বলে' বিবেচিত হ'বে। এই সব জানিয়ে ক্যাষ্টেলি গ্যালিলিওর কাছে একখানি পত্র লিখেছিলেন। গ্যালিলিও তার জবাবে লেখেন—

'ধর্ম্মগ্রন্থ ভুল বলেনা, কিন্তু যাঁরা তার ব্যাখ্যা করেন তাদের বহু ভুল হয়।......প্রকৃতিও ঈশ্বরের সৃষ্ট। প্রকৃতি কখনও আপন নিয়ম ভাঙ্গে না। প্রকৃতির নিয়ম মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে নিয়মের খেলা চলতেই থাকে। আপন চেতনা দিয়ে মানুষ যখন প্রাকৃতিক সত্যের সন্ধান পায় তখন ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে তাকে সেটা ভুলতে বলা বুদ্ধিমানের কথা নয়।...........আমাদের ইন্দ্রিয় বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যাকে সত্য বলে জেনেছে, ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে তাকে অস্বীকার করা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার।.........মানুষের মননশক্তিকে কে সীমা দিয়ে বাঁধতে পারে ? কে এমন কথা বলিতে পারে যে বিশ্ব সম্বন্ধে সে যা জানে তা ছাড়া আর কিছুই জানার নাই ?"

এই পত্রের একখানি অনুলিপি কোন ভাবে 'ইনকুইজিশনে'র হস্তগত হয়। তারা তৎক্ষণাৎ গ্যালিলিওকে রোমে ডেকে পাঠালেন। গ্যালিলিও মেডিসিয়ার গ্রাণ্ড ডিউকের সুপারিশপত্র নিয়ে রোমে গেলেন।

গ্যালিলিওর তখন খ্যাতি বা প্রভাব প্রতিপত্তির কোন অভাব ছিল না। সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজাল বিস্তারেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। সমবেত ধর্ম্মনেতাদের যুক্তিকে তিনি তর্কজাল বিস্তার করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তা সত্বেও 'ইনকুইজিশন' তাকে ধিক্কার দিল। বলে দেওয়া হ'ল যে তিনি যেন আর কোপারনিকানবাদের স্বপক্ষে কোন কিছু প্রচার না করেন। এই প্রসঙ্গে পোপ কোপারনিকাসের 'জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব' নামের অমর গ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করলেন। গ্যালিলিও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মেডিসিয়ায় ফিরে গেলেন।

আকাশে মাঝে মাঝে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। এদের কেন্দ্র থাকে উজ্জ্বল আর অতিদীর্ঘ পুচ্ছটি থাকে সে তুলনায় একটু কম আলোকিত। কয়েকদিন আকাশে থেকে এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাচীন ধর্ম্মনেতারা ধূমকেতুকে দৈবপ্রেরিত দূত হিসেবে দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে ধূমকেতু রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্ভাগ্যের সূচনা করে। গ্যালিলিওর সময়ের বহু পরে বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ হ্যালী আবিষ্কার করেন যে ধূমকেতুরা সূর্য্যকে নাভিতে রেখে এক অতিদীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়ায় ও নির্দ্দিষ্ট সময় পরে সূর্য্যের কাছে ফিরে ফিরে আসে। গ্যালিলিও ধূমকেতুদের সাধারণ জ্যোতিষ্কদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে আকাশে তিনটি ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। গ্যালিলিওর তত্ত্বাবধানে তাঁরই এক ছাত্র এদের গমন পথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। এজন্যও ধর্ম্মনেতারা গ্যালিলিওর ওপর ক্রুদ্ধ হন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দুই বিশ্ব পদ্ধতি

সম্বন্ধে কথোপকথন' সমাপ্ত করেন। ইতিমধ্যে গ্যালিলিওর অন্যতম সমর্থক কার্ডিনাল বার্বেরিনি পোপ হয়েছিলেন। গ্যালিলিও তার কাছে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করার অনুমতি চাইলেন।

পোপ এ ব্যাপারে দুটি সর্ত আরোপ করলেন। তিনি বললেন যে একথা লিখতে হবে যে কোপারনিকাসের তত্ত্ব অনুমানমাত্র। কোপারনিকানবাদের বিরুদ্ধে পোপ নিজে একটি যুক্তি তৈরী করে আত্মশ্লাঘা বোধ করছিলেন। তিনি দাবী করলেন যে এ যুক্তিটিকেও গ্রন্থে রাখতে হবে। গ্যালিলিও পোপের সব দাবী মেনে নিয়ে 'কথোপকথন' প্রকাশ করলেন।

এই গ্রন্থে তিনটি চরিত্র ছিল। তাদের একজন ছিল দৃঢ় কোপারনিকানবাদী, দ্বিতীয়জন কোপারনিকানবাদবিরোধী আর তৃতীয়জন নিরপেক্ষ মন্তব্যকারী। দ্বিতীয়জন ছিল টলেমী ও অ্যারিষ্টটলের অন্ধ সমর্থক। তার নাম ছিল 'সিম্প্লিসিয়ো' বা সরল বিশ্বাসী, একটু বোকাটে ধরণের আর কি!

গ্যালিলিও এই গ্রন্থে অ্যারিষ্টটলের ধারণার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম পরিচালনা করলেন। সুদূর জ্যোতির্লোক থেকে পার্থিব স্থিতিগতির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত কোথাও তিনি ওদের রেহাই দিলেন না। অ্যারিষ্টটলের মতামত ভুল হ'লেও তা ছিল এক সামগ্রিক বিশ্বপ্রেক্ষা। অ্যারিষ্টটলবাদকে পরাভূত করার জন্য এক পাল্টা সামগ্রিক বিশ্বপ্রেক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্যালিলিও এই নূতন বিশ্বপ্রেক্ষার ভিত্তি গড়ে তুললেন।

গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। কোপারনিকাসের গ্রন্থ বিজ্ঞানী ও অংকশাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া কারো বুঝার উপায় ছিলনা। গ্যালিলিও কিন্তু জনসাধারণকে কোপারনিকানবাদে দীক্ষিত করতে এগিয়ে এলেন। সাহিত্যিক নিপুণতার সঙ্গে তিনি কোপারনিকানবাদের তাৎপর্য্য বর্ণনা করলেন। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তীক্ষ্ণ

বিদ্রূপে শাণিত হয়ে উঠল তার লেখনী। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রভাব যাই হয়ে থাকুকনা কেন, সমাজের পুরোধায় যারা ছিলেন তাদের প্রতিক্রিয়া খুব সুখকর হ'লনা।

তখনকার দিনে পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ ব্যক্তিতে রাজসভা ভর্তি ছিল। তাদের বক্তব্যের দুই একটা নমুনা এই।

'আমি অ্যারিষ্টটলের বই গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনেকবার পড়েছি। আমি তোমাকে বলছি যে সেখানে এরকম কিছু নেই। পুত্র, তুমি গিয়ে নিজেকে শান্ত কর। নিশ্চিত বুঝো যে যা দেখেছ তা হয় তোমার চোখ আর নয়ত তোমার কাঁচের দোষের বিভ্রম মাত্র।'

'মাথার সাতটা জানালা আছে, দু'টো নাক, দু'টো চোখ, দু'টো কান আর মুখ। এই রকম আকাশেও সাতটি গ্রহ আছে। ধাতুর সংখ্যাও সাত বলে আমরা জানি। এই ধরণের অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা দেখাতে পারি যে গ্রহের সংখ্যা সাত হতেই হ'বে। অধিকন্তু বৃহস্পতির উপগ্রহদের খালি চোখে দেখা যায় না। অতএব তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার প্রাচীন জাতিসমূহ থেকে আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিরা সবাই এক সপ্তাহকে সাত দিনে ভাগ করেছেন ও সাতটি গ্রহের নাম অনুযায়ী সাতটি দিনের নাম রেখেছেন। এখন আমরা গ্রহের সংখ্যা বাড়ালে সমস্ত পদ্ধতিটাই ধূলোয় লুটোবে।'

কেপলারকে এক পত্রে গ্যালিলিও লিখেছিলেন—

'প্রিয় কেপলার! তুমি এখানে থাকলে বড় ভাল হ'ত, দু'জনে প্রাণের সাধ মিটিয়ে হেসে নিতাম। পদুয়ার দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে আমি বার বার বলেছি আমার দূরবীণের ভেতর দিয়ে চাঁদ ও গ্রহদের দেখতে। কিন্তু তিনি প্রতিবারেই অস্বীকার করেছেন। কেপলার! তুমি এখানে থাকলে কি মজাই না হ'ত! এই মহামূর্খের কাণ্ডকারখানা দেখে কি জোরেই না আমরা একত্রে বসে হাসতাম।'

গ্যালিলিও পদুয়াতে থাকতে চাননি। চেষ্টা করেই তিনি পদুয়া

ছেড়ে মেডিসিতে এসেছিলেন। পডুয়া ও মেডিসির মধ্যে কিন্তু মূলগত পার্থক্য ছিল। পডুয়া ছিল ভিনিসের প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে প্রাধান্য ছিল নবোদ্ভূত ব্যবসায়ী শ্রেণীর। ভিনিসের মৈত্রী ছিল মধ্য য়ুরোপের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে। তাই ভিনিসে পোপের কোন প্রভাব ছিল না। অন্যদিকে মেডিসি ছিল একদল অলস বিলাসমগ্ন উদ্যোগহীন ভূতপূর্ব ব্যবসায়ীর দ্বারা শাসিত। তাই এ দেশ ছিল 'ইনকুইজিশনে'র স্বৈরতান্ত্রিক লীলাভূমি। তাই দেশ নির্বাচনের ব্যাপারে গ্যালিলিও বোধ হয় একটু ভুলই করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কারগুলি যে পুরাতন চিন্তাধারায় আঘাত করে প্রতিক্রিয়াকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে তা সম্ভবত তিনি দেখেননি। এই প্রতিক্রিয়া যাতে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য যে পডুয়ার মত কোন প্রজাতান্ত্রিক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর চাকরী করা ঠিক হ'ত তা হয়ত তিনি বুঝতে পারেন নি। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকর্তাদের অধীনে বিনা কাজে বৃত্তি ভোগ করলে যে অনেক বাধ্যবাধকতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় তাও তিনি বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না।

স্বৈরতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে হয়নি তাও নয়। তাঁর জীবিতকালেই ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়। রামধনু সম্বন্ধে বাইবেলের বর্ণনাবিরোধী এক মত প্রকাশ করার অপরাধে আর্কবিশপ এ্যাণ্টনিও ডোমিনিশ 'ইন্‌কুইজিশনে'র কারানরকে নিক্ষিপ্ত হন। বন্দীদশায় মারা যাওয়া সত্বেও তার মৃতদেহ দগ্ধ করা হয়। এ খবরও গ্যালিলিওর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু গ্যালিলিও রাজনীতি সম্বন্ধে ততটা সচেতন ছিলেন না। তাই এই ভয়াবহ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে একদিন তাঁর বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হ'তে পারে এ কথা সম্ভবত তিনি ভাবতেও পারেননি। কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনাই ঘটল।

সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার নিয়ে জেস্যুইট শীনার গ্যালিলিওর

ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে পোপকে বোঝাল যে গ্যালিলিওর পুস্তকে 'সরল বিশ্বাসী' নামে যে চরিত্র উপস্থিত করা হয়েছে তা আসলে পোপেরই ব্যঙ্গচিত্র। প্রমাণ হিসেবে শীনার দেখাল যে পোপের যে যুক্তি গ্রন্থে রাখতে গ্যালিলিও রাজী হয়েছিলেন তা 'সরলবিশ্বাসী'ই বলেছে।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে 'ইন্‌কুইজিশন' 'তুই বিশ্বপদ্ধতি সম্বন্ধীয় কথোপকথন' গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করল। গ্যালিলিওকে বিচারের জন্য 'ইন্‌কুইজিশনে'র আদালতে হাজির হ'তে বলা হ'ল।

গ্যালিলিওর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তবু কিছু দিন দেরী করে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি রোমে গেলেন।

রোমে নিক্কোলিনি ছিলেন গ্যালিলিওর প্রধান পরামর্শদাতা। গ্যালিলিওর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ইনিই রাজনীতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মহাবিপদ এগিয়ে আসছে। তাই তিনি চুপি চুপি গ্যালিলিওকে বললেন—'বাদ প্রতিবাদ কিছু কোরো না। দরকার হ'লে পৃথিবী নিশ্চল একথাও স্বীকার করে নেবে।'

গ্যালিলিওর বয়স তখন প্রায় সত্তর। আপন মতের ন্যায্যতা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বন্ধুর ভয় দেখে ও পরামর্শ শুনে তার মন ভেঙে পড়ল।

নিক্কোলিনি বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য পোপের কাছে বহু দরবার করলেন। কিন্তু পোপ ধর্ম্মের অবিচলিত রক্ষাকর্তা হিসেবে তার 'কর্তব্যে' দৃঢ় রইলেন। বিচার সুরু হ'ল।

বিচারের প্রথম দিকে গ্যালিলিও নিক্কোলিনির বাড়ীতে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ তিন দিন তাকে 'ইন্‌কুইজিসনে'র নির্য্যাতন কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়।

একদিন যিনি সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজালে পোপ ও কার্ডিনালদের মতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তিনি আজ নির্য্যাতনে ভেঙে পড়লেন। নতজানু হয়ে তাঁকে বলতে বাধ্য করা হ'ল যে তিনি যা কিছু লিখেছেন সব মিথ্যা, কোপারনিকানবাদ সম্পূর্ণ ভুল। প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি যে জীবনে আর কখনও ধর্ম্মগ্রন্থবর্ণিত মতের বিরোধিতা করবেন না। এই সব কথা কাগজে লিখে দিতেও হ'ল তাঁকে। এই দলিল হাজারে হাজারে ছাপিয়ে মহামান্য পোপ দূর দূরান্তরে প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

দৈহিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গ্যালিলিও নত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তবু তাঁর অন্তর ছিল ন্যায় ও সত্যের পূজারী। আদেশমত সব কিছু বলেও তিনি মাথা নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিলেন—

'ই পুর্ সি মুভি'—তবু পৃথিবীই ঘোরে।

প্রাণ বাঁচলেও মুক্তি মিলল না। প্রথমে তাকে সিয়েনার এক বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। পরে আরসেট্রিতে গ্যালিলিওকে তাঁর নিজের বাড়ীতেই অন্তরীণ করে রাখা হয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাকে চার্চের সশস্ত্র প্রহরী ও গুপ্তচর বেষ্টিত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে।

বন্ধুরা নিরাপত্তার খাতিরে অধিকাংশ গবেষণামূলক রচনা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। গ্যালিলিওর শরীর ও মন দুই ভেঙে পড়েছিল। এই সময়ে তিনি লেখেন—

'নতুন পর্য্যবেক্ষণে আমি আর আনন্দ পাই না।'

তবু অভ্যাসবশে কিছু কিছু গবেষণা করতে লাগলেন তিনি। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'দুইটি নূতন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তাঁকে বাধ্য হয়ে যে বিচারের সামনে মাথা পেতে দিতে হয়েছিল তার ন্যায্যতা গ্যালিলিও কখনও মানেননি। ফরাসী রাজপ্রতিনিধি

পেরিসেক গ্যালিলিওকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। গ্যালিলিও তাকে লেখেন—

'আমি সান্ত্বনা চাই না, কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি। যদি ভুল করতাম তবেই দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষার প্রশ্ন উঠত।······যখন অন্যায়ভাবে কাউকে অভিযুক্ত করা হয়, তখন নিজেদের বে-আইনী কাজকে আড়ালে রাখার জন্য বিচারকদের বেশী করে কঠোর হ'তে হয়।'

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবী কবি মিলটন গ্যালিলিওর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এত বড় একজন মনীষির এই নির্য্যাতন মিলটনের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন লেখায় তিনি তাঁর এই অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

যথেষ্ট সতর্কতা না নিয়ে সৌর পর্য্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার ফলে গ্যালিলিও অন্ধ হয়ে যান। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থাতেই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।

জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারাও ভুল ত্রুটি কিছু কিছু না করে পারেন না। গ্যালিলিওর কার্য্যকলাপের মধ্যেও এমন কিছু কিছু জিনিষ ছিল যার সঙ্গে সকলে একমত হ'তে পারেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সামাজিক তাৎপর্য্য ও আর্থিক মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান হয়েও গ্যালিলিও সমসাময়িক রাজনীতি কিছুই কেন বুঝলেন না, বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতি কিভাবে জড়িয়ে গেছে তা কেন ধরতে পারলেন না, এতে অনেকেই বিস্ময় বোধ করেন। 'দুই বিশ্বপদ্ধতি সম্বন্ধে কথোপকথন' গ্রন্থে তিনি কোপারনিকানবাদকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার কোন আগ্রহ দেখাননি। পরে তিনি বলেছিলেন যে জোয়ার ভাঁটাই হ'ল পৃথিবীর গতির প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তির মধ্যে কোন সত্যতা ছিল না। টাইকোব্রাহীর যুগান্তকারী পর্য্যবেক্ষণ বা কেপলারের গ্রহগতির সূত্র সম্বন্ধেও গ্যালিলিও উদাসীন ছিলেন।

কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর একটি জীবনকালের মধ্যে যা করে গেছেন তারও তুলনা নেই! বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁদের মাথা অন্য সব বিজ্ঞানীর মাথা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে গ্যালিলিও তাঁদের অন্যতম। সত্যের জন্য যাঁরা নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, বিশ্ববাসীর সামনে সত্যের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার জন্য যাঁরা অসীম ক্লেশ বরণ করে নিয়েছেন গ্যালিলিও তাঁদেরও অন্যতম।

গ্যালিলিও গ্যালিলি যে বছর মারা যান সেই বছরেই ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কনসায়ারে আইসাক্ নিউটন জন্মগ্রহণ করেন।

সাত

আইসাক্ নিউটন

ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কনসায়ারে গ্রান্থাম সহর অবস্থিত। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে কল্‌ষ্টারওয়ার্থ নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে এক অতি সাধারণ খামার বাড়ীতে আইসাক্ নিউটন জন্মগ্রহণ করেন।



আইসাক্ নিউটন

জন্মের আগেই পিতৃহীন হয়েছিলেন তিনি। জন্মও হয়েছিল অসময়ে। আকার ও অবস্থা দেখে ধাত্রীরা ভেবেছিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটি মারা যাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল শিশুটি।

গ্রান্থামের রাজস্কুলে নিউটনের বিদ্যারম্ভ হয়। লেখাপড়ায় খুব যে ভাল ছিলেন তিনি তা নয়। তবে যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। রাজস্কুলের দেয়ালে অন্যান্য ছেলেদের মত নিউটনও নিজের নাম খোদাই করেছিলেন। কাঁচা হাতের সেই লেখা আজ পর্য্যন্ত সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নিউটনের জন্মের পর তার মা আবার বিয়ে করেছিলেন। নিউটনের বয়স যখন তেরো তখন তার বিপিতা মারা গেলেন। সেই টানাটানির সময়ে আইসাককে স্কুল ছেড়ে খামারের কাজে যোগ দিতে হ'ল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে আইসাক খামারের কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই বাধ্য হয়েই

আবার স্কুলে আসতে হ'ল তাকে। উনিশ বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ করে তিনি ক্যাম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে ভর্তি হন।

কলেজেও যে নিউটন খুব মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন তা নয়। তবু তার জ্ঞানের ভিত্তি এখানেই গঠিত হয়েছিল। কেপলারের 'আলোকশাস্ত্র', ইউক্লিডের জ্যামিতি ও ডেকার্টের কার্টেসীয় জ্যামিতির প্রতি তিনি এখানে থাকতেই আকৃষ্ট হন কার্টেসীয় জ্যামিতি হ'ল বীজগণিত ও ইউক্লিডীয় জ্যামিতির এক অপূর্ব সমন্বয়। দুইটি অক্ষ-সমন্বিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত রেখার প্রকৃতি বিচারে এই নতুন জ্যামিতি এক মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

কার্টেসীয় জ্যামিতির স্রষ্টা ছিলেন বিখ্যাত মনীষি রেঁনে ডেকার্ট। আপন জন্মভূমি ফ্রান্স ত্যাগ করে তিনি হল্যাণ্ডে বসবাস করে বিজ্ঞানসাধনায় দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর ঘূর্ণিতত্ত্ব কম প্রভাব বিস্তার করেনি।

তিনি বলেছিলেন যে বিশ্ব এক সর্বব্যাপী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। এই পদার্থ নিরন্তর বৃত্তগতিশীল। এই গতিশীল পদার্থ ঘূর্ণিসঙ্কুল। সব ঘূর্ণির কেন্দ্রেই আছে সূর্য্য। জলের মধ্যে ঘূর্ণি থাকলে খড়কুটো যেমন ঘোরে, গ্রহেরাও তেমনি ঘূর্ণির পাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংক্ষেপে এই হ'ল ডেকার্টের গ্রহগতির ব্যাখ্যা।

কেপলারের সূত্রগুলি ছিল ডেকার্টের কাছে অবহেলার বস্তু। ঘূর্ণিতত্ত্ব যে প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সঙ্গে মেলে না এ বিষয়েও তিনি ছিলেন অন্ধ। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ডেকার্টের জীবিত-কালে এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন এই ঘূর্ণিতত্ত্ব য়ুরোপের বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছিল।

ট্রিনিটি থেকে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে অতি সাধারণভাবে নিউটন স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ১৬৬৫-'৬৬ খৃষ্টাব্দ ইংল্যাণ্ডের

ইতিহাসে অতি ভয়াবহ স্মৃতির দিন। এক ব্যাপক প্লেগ-মহামারী এই সময়ে ইংরেজদের অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ছাত্ররা সব সহর ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। নিউটনও ফিরে যান দেশের বাড়ীতে। এই অবসরের সময়ে তিনি ভবিষ্যতে কি কি কাজ করবেন তার একটা খসড়া করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মোটামুটি এই কার্যক্রম অনুযায়ীই কাজ করে গেছেন।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে নিউটন কেমব্রিজে ফিরে আসেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আইসাক্ ব্যারো (জন্ম ১৬৩০—মৃত্যু ১৬৭৭) নিউটনের গণিতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিউটনের জন্য উপযুক্ত আসন খালি করে দেওয়ার মানসে তিনি তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। নিউটন সহজেই এই পদে নিযুক্ত হন।

উক্ত পদে নিযুক্ত থেকে নিউটন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালান। তার পরে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হয়ে লণ্ডন চলে যান। তের মাস পরে আবার তিনি পুরোনো কাজে ফিরে আসেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি টাঁকশালের 'ওয়ার্ডেন' হয়ে লণ্ডনে যান ও পাকাপাকিভাবে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিন বছর পরে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ পদ পান।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দু'তিন বছর অসুস্থতা ভোগ করে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ স্যার আইসাক্ নিউটন দেহত্যাগ করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, আলোকবিদ্যা ও অংকশাস্ত্র, এই বিষয়-গুলিতে নিউটন বিপ্লবাত্মক গবেষণা করেছিলেন। রসায়নশাস্ত্র ও অর্থনীতিশাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল। এ্যান্নুইটি ধরণের বাৎসরিক হিসাবপত্রেও নিউটন যথেষ্ট মনযোগ দিতেন। তবে ছোট কাজ নিজের নামে ছাপাতে তিনি চাইতেন না, বেনামীতে প্রকাশ করতেন

নিউটনের অবদান বিজ্ঞানে অবিস্মরণীয়। কবি পোপের লিখিত দু'টি কবিতার লাইন নিউটনের জন্মগৃহে খোদাই করা আছে। তাতে পোপ লিখেছেন—

'প্রকৃতি ও তার নিয়মগুলি রাতের অন্ধকারে ঢাকা ছিল। ঈশ্বর বললেন—'নিউটন জন্ম নিক্!' আর সব কিছু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।'

অবশ্য এই কবিতায় যে অত্যুক্তি আছে নিউটন কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না ; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে অসীম, মানুষের পক্ষে তা অনায়াত্ত না হ'লেও, মানুষ যা জানে তা যে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের সামান্য অংশমাত্র, একথা নিউটন বুঝতেন। তাই তিনি বিনয় সহকারে বলেছিলেন—

'আমি একটি ছোট ছেলের মত সমুদ্রের তীরে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে বেরিয়েছি। মাঝে মাঝে সাধারণ নুড়ির চেয়ে একটু মসৃণ, একটু সুন্দর উপলখণ্ড হয়ত খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু আমার সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে জ্ঞানের অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্র।

তিনি আরও লিখেছিলেন—

'আমার দৃষ্টি যদি অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে তো তা এই জন্যই সম্ভব হয়েছে সে আমার পূর্বসূরী মহামানবেরা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন।'

কোপারনিকাসের সময় থেকেই য়ুরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রাথমিক শিল্পের যুগ সুরু হয়। এই সময়েই নবোদ্ভূত ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে পুরাতন ভূম্যধিকারীদের সংঘর্ষের ফলে সমাজ ও বিজ্ঞান গতিশীল হয়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ডে এই বিকাশ চলেছিল অতি ধীর গতিতে। তার মূল কারণ এই যে ভূম্যধিকারীরা ব্যবসায়ে অংশ নিয়ে শুধুমাত্র সামন্ত রইলেন না, আবার ব্যবসায়ীরাও বড় বড় জমিদারী কিনে সামন্তস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। এই কারণেই

ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিপ্লব অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবু ১৬৪০ থেকে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে বেশ কিছু অশান্তি দেখা গিয়েছিল। ফরাসী গৃহযুদ্ধের মত তীব্র ও মৌলিক না হ'লেও ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধে রক্তপাতের অভাব ঘটেনি। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের 'গৌরবময় বিপ্লবে' রাজা ও ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়, ব্যবসায়ীরা সরকার গঠনে যথাযোগ্য অংশলাভ করেন।

ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও বাণিজ্যে রত হয়েছিলেন। সমুদ্রে প্রভুত্ব বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত ধরণের রণতরীর ও নৌযুদ্ধের নতুন নতুন কলা কৌশলের। এই দিক দিয়ে বলবিদ্যার উন্নতি খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্রের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকায় স্পেনের আর্মাডা বা নৌবহর বিপথগামী হয়ে বিনষ্ট হয়েছিল। সমুদ্রে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাই গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার হয়েছিল। তখনকার দিনে জোয়ার ভাঁটার নিয়মকানুন লোকের জানা ছিল না। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌযুদ্ধের জন্য এই জ্ঞানের মূল্যও অসীম।

ওলন্দাজদের ইতিহাস থেকে ইংরেজেরা এটুকু বুঝেছিল যে বিজ্ঞান এই সব তথ্য না দিলে ব্রিটানিয়া সমুদ্রতরঙ্গের ওপর আধিপত্য করতে পারবে না। জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র যে কেপলার-গ্যালিলিও-ডেকার্টের পরবর্তী কালে য়ুরোপ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে আপন প্রবক্তা খুঁজে পেল, এটা মোটেই আকস্মিক নয়। যুগ প্রতিভাকে গঠিত করে, খুঁজে বের করে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নিউটনের বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হুক্ তাঁর 'মাইক্রোগ্রাফিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় 'রয়্যাল সোসাইটি'র গবেষণার প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে

গিয়ে এই যুগের প্রয়োজনকেই বড় করে দেখিয়েছিলেন। তিনি লেখেন—

'যে সব পরীক্ষার উদ্দেশ্য নিতান্তই জ্ঞানলাভ করা বা তাত্ত্বিক সত্যের সন্ধান করা, সে সবকে যে আমরা একেবারে বর্জন করব তা' নয়। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে এমন সব পরীক্ষা চালান যাতে করে শ্রমশিল্পের বর্তমান অবস্থার উন্নতি ও সুবিধা করে দেওয়া যায়।'

এই যুগেই আইসাক নিউটন ইংল্যাণ্ডকে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান দান করেছিলেন। এবার আমরা এই আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পৃথিবী সর্বদাই তার নিকটবর্তী বস্তুদের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। অ্যারিষ্টটলবাদীরা পৃথিবীর কেন্দ্রকে বিশ্বজগতের 'স্বাভাবিক কেন্দ্র' বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা বলতেন যে সকল বস্তুই বিশ্বজগতের স্বাভাবিক কেন্দ্রে ফিরে আসতে চায়।

কোপারনিকাস অ্যারিষ্টটলীয় ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে দেখালেন যে সূর্য্যই বিশ্বজগতের কেন্দ্র। অ্যারিষ্টটলীয়রা মনে করতেন যে গ্রহগুলি বিভিন্ন স্ফটিক গোলকের ওপর বসান, আর সেই স্ফটিক-গোলকগুলি দেবদূতরা ঘোরায়। কুসার নিকোলাসের ধারণা গ্রহণ করে কোপারনিকাস কিন্তু বললেন যে কোন গোলককে মহাশূন্যে রাখলে সে স্বতঃই বৃত্তপথে আবর্তিত হ'তে থাকবে। ভূকেন্দ্রিক ও সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ এইভাবে আবর্তনের তথ্য বিভিন্নভাবে বোঝাতে চাইল। পৃথিবীর আকর্ষণের কোন ব্যাখ্যা কিন্তু কোপারনিকানবাদে পাওয়া গেল না।

উইলিয়াম গিলবার্ট চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন যে সূর্য্য ও গ্রহগণ সকলেই গোলাকার চুম্বকধর্ম-বিশিষ্ট বস্তু। গোলাকার চুম্বক 'টেরেল্লা'

তৈরী করে গিলবার্ট দেখালেন যে চুম্বক-গোলকের গতিপ্রকৃতি গ্রহদের গতিপ্রকৃতির অনুরূপ। তিনি বললেন যে কোন চুম্বককে দু'ভাগ করতে গেলে ভাগ করার জায়গায় দু'দিকে বিপরীতধর্ম্মী চুম্বকশক্তির সৃষ্টি হয় ও তার ফলে অংশ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে চায়। এইজন্যই প্রস্তরখণ্ড পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে গেলে পৃথিবী তাকে টেনে নেয়। এই হ'ল গিলবার্টের মতানুযায়ী পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষের ব্যাখ্যা। তিনি আরও দেখালেন যে চুম্বকগোলকের ভর যত বেশী হ'বে তার আকর্ষণ শক্তিও তত প্রবল হ'বে। তিনি একথাও লিখেছিলেন যে এই আকর্ষণ এক পারস্পরিক শক্তি, পৃথিবী ও প্রস্তরখণ্ড উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করে, তবে যার ভর যত বেশী তার প্রভাব তত বেশী দেখা যায়। গিলবার্ট মনে করতেন যে গ্রহদের অক্ষ-আবর্তনও চুম্বকধর্ম্মের ফল। একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে গিলবার্টের ধারণাগুলি অসম্ভব ব্যাপারের পর্য্যায়ে না পড়লেও তিনি একথা বোঝাতে পারলেন না যে গ্রহেরা কেন সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে বা উপগ্রহেরা গ্রহের চারদিকে ঘোরে। চুম্বকতত্ত্বের সাহায্যে অভিকর্ষ, অক্ষ-আবর্তন ও গ্রহ-উপগ্রহদের কক্ষ-আবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই রকম একটা সাধারণ ধারণার কথা তিনি প্রচার করে গেলেন মাত্র।

ডেকার্টের সমসাময়িক বিজ্ঞানী রোবারভাল বলেন যে বিশ্বে যে কোন দু'টি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এরই নাম মহাকর্ষ। তিনি বলেন যে এই মহাকর্ষের অস্তিত্বের জন্য পৃথিবীর আকর্ষণে চন্দ্র পৃথিবীর দিকে চলে আসত, কিন্তু অন্তবর্তী ঈথর সমুদ্রের বাধার জন্য আসতে পারে না। রোবারভালের এই মত প্রচারিত হয়েছিল ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে।

অতি প্রাচীন বিজ্ঞানী প্লুটার্কের লেখায় চন্দ্রের গতিকে দড়ির মাথায় বাঁধা ঘূর্ণায়মান পাথরের গতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আলফোন্‌সি বোরেল্লি বললেন যে প্রত্যেক গ্রহকেই সূর্য্য টানে। কিন্তু পাথর যেমন আপন গতির ফলে দড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার শক্তি লাভ করে, গ্রহও তেমনি আপন গতির ফলে কেন্দ্রাতিগ বলের অধীন হয়। এই কেন্দ্রাতিগ বলই মহাকর্ষের কেন্দ্রমুখী বা কেন্দ্রাভিগ বলকে নাকচ করে ও সেইজন্যই গ্রহ সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয় না। কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বলের আংকিক তত্ত্ব জানা না থাকায় বোরেল্লির পক্ষে এর বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হাইজেন্স কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বলের আংকিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখালেন যে এই বল=আবর্তনশীল বস্তুর ভর×রৈখিক গতিবেগের বর্গ÷বৃত্তপথের ব্যাসার্দ্ধ। কিন্তু ডেকার্টের ঘূর্ণিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলে এর সাহায্যেও হাইজেন্স অভিকর্ষ বা গ্রহগতির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। এই ব্যাখ্যা দিতে হ'ল নিউটনকে তার মহাকর্ষ-সূত্রের সাহায্যে।

নিউটনের সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মহাকর্ষসূত্রের ধারণাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে নানা বিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। কেপলার এমন কথাও বলেছিলেন বলে আমরা দেখেছি যে সূর্য্য গ্রহের ওপর যে বল প্রয়োগ করে তা দূরত্বের বর্গের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতসম্পন্ন। ক্রিষ্টোফার্ রেন্, রবার্ট হুক্ ও হ্যালী, এই তিনজন ইংরেজ বিজ্ঞানীই নিউটনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এদের মধ্যে রেন্ ও হ্যালী নিউটনের খুবই অনুগত ছিলেন। হুক্ কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়া বিবাদ করতেন। পরবর্তীকালে রবার্ট হুক্ নিজেকেই মহাকর্ষসূত্রের প্রকৃত আবিষ্কারক বলে দাবী করে, নিউটনের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

নিউটনের ভাগ্নী ক্যাথারিন্ বারটন্ বলেছিলেন যে উলস্‌থর্পের বাগানে আপেল ফল মাটিতে পড়তে দেখে নিউটন মহাকর্ষের কথা ভাবতে সুরু করেন। নিউটনের বন্ধু ষ্টুকেলিও তার গ্রন্থে এ কথা লিখেছিলেন। কিন্তু আপেল পড়তে দেখার পরও বিশ বছর পর্য্যন্ত নিউটন মহাকর্ষ সম্বন্ধে কোন ধারণায় পৌঁছোতে পারেন নি। ১৬৬৬ তে তিনি ভাবতেন যে পৃথিবীর আকর্ষণ চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সময়েই তিনি কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করেন যে আকর্ষণ-বল দূরত্বের বর্গের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতসম্পন্ন। অবশ্য এ কথা প্রকাশ করার মত পর্য্যাপ্ত তথ্য তার কাছে ছিল না। একথাও সত্য যে রেন্, হুক্ ও হ্যালী স্বতন্ত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। নিউটন চন্দ্রের গতি সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র কষে দেখতে পেলেন যে দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতের সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীর দিকে চন্দ্রের ত্বরণ হওয়া উচিত ·০০৮৯৫, অথচ প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণ ও হাইজেন্সের কেন্দ্রাতিগ ত্বরণসূত্র অনুযায়ী তা হয় ·০০৭৭৫। এই বৈষম্য নিউটনকে নিরাশ করে ও বহুদিন তিনি আর এ নিয়ে কাজ করেন নি। পরে অবশ্য বোঝা যায় যে পৃথিবীর ব্যাস নিউটন যা ধরেছিলেন তা সঠিক ছিল না ও ইংরেজী মাইলের সঙ্গে নটিকাল্ মাইলকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন। হিসেব এই কারণেই মেলেনি।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নিউটন হুককে লেখেন যে পৃথিবী যদি ঘোরে তো ওপর থেকে কোন বস্তু ফেল্‌লে সেটা একটু পূবে সরে পড়্‌বে। হুক্ লেখেন যে তিনি পরীক্ষা করে অনুরূপ ফল পেয়েছেন, তবে পথটা কি ধরণের হ'বে তা ঠিক করতে পারছেন না। নিউটন সে পত্রের জবাব দেননি। কিন্তু হ্যালীর নিকট লিখিত পত্রে জানান যে পথটা অধিবৃত্তাকার হ'বে বলে তিনি প্রমাণ করেছেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হুক্, হ্যালীলও রেন্‌গুনে একত্র

হয়েছিলেন। তাঁরা দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাত সম্বন্ধে একমত হ'লেন। কিন্তু এ ধরণের বলের অধীনে গ্রহের গতি কেমন হ'বে তা কষে বার করতে পারলেন না। হ্যালী কেম্‌ব্রিজে গিয়ে নিউটনকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। নিউটন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিলেন যে পথটা হ'বে উপবৃত্তাকার, আকর্ষণকেন্দ্র এই উপবৃত্তের এক নাভিতে থাক্‌বে। বিস্মিত হ্যালী হিসেবপত্র চাইল। নিউটন তখন তা খুঁজে পেলেন না বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে হিসাব 'রয়্যাল সোসাইটি'র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিউটন একথাও বললেন যে বলবিদ্যা ও গ্রহগতি সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ মতবাদ সমন্বিত একখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করছেন। ১৬৮৪ থেকে ১৬৮৬ পর্য্যন্ত পুরো দু' বছর নিউটন এই গ্রন্থ রচনার জন্য পরিশ্রম করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪২ থেকে ৪৪। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হ্যালীর অর্থে 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল।

ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ তখন সমাপ্তির পথে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের উইলিয়াম্ দি অরেঞ্জ ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সব সর্ত মেনে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। তারই একবছর আগে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হয়।

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি বর্ণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে,' জ্যামিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রিন্সিপিয়ার সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক আবিষ্কার হ'ল মহাকর্ষ সূত্র।

'বিশ্বজগতে যে কোন দুইটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ-বল বস্তু দুইটির ভরের গুণফলের সহিত অনুপাত সম্পন্ন ও উভয়ের দূরত্বের বর্গের সহিত বিপরীত অনুপাত সম্পন্ন।'

$$\text{আকর্ষণ বল} = \text{বিশ্বধ্রুবক } G \times \frac{\text{প্রথম বস্তুর ভর} \times \text{দ্বিতীয় বস্তুর ভর}}{\text{উভয়ের দূরত্বের বর্গ}}$$

এই সূত্রের সাহায্যে গ্রহ, ধূমকেতু, চন্দ্র ইত্যাদির জটিল গতির ব্যাখ্যা

দেওয়া সম্ভব হ'ল। জোঁয়ার ভাঁটাকে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের ফল হিসাবে পরিষ্কার দেখান গেল। নিউটন দেখালেন যে কেপলারের তিনটি সূত্রই মহাকর্ষ সূত্রের সঙ্গে খাপ খায়।

পৃথিবী যে বলে প্রস্তরখণ্ডকে আপন কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, সৌরমণ্ডলের গ্রহাদির মধ্যেও যে একই রকম আকর্ষণ বর্তমান, এই তথ্যই নিউটন প্রতিষ্ঠিত করলেন। পার্থিব গতির সঙ্গে জ্যোতিষ্কগতির এই সমন্বয় ও ঐক্য সাধনই নিউটনের আবিষ্কারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জলবিষুব ও মহাবিষুব বিন্দুর ক্রম পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে সহজে দেওয়া গেল। গোলাকার বস্তুর সমস্ত ভরকে যে তার কেন্দ্রে সংহত বলে ধরা যায়, তাও নিউটনই প্রথম দেখালেন। ডে-কার্টের ঘূর্নি-তত্ত্বকে নিউটনই কবর দিলেন।

নিউটনের আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ত্রিকোণ কাঁচ তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। লোকে তার ভেতর দিয়ে নানা রকমের রং দেখতে পেত। নিউটনও কেম্ব্রিজের নিকটবর্তী এক মেলা থেকে ত্রিকোণ কাঁচ কিনেছিলেন। সাদা সূর্য্যালোক এই ত্রিকোণ কাঁচের ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে সাতটি রংয়ে বিভক্ত হয়ে যায় বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল, 'বেণীআ সহ কলা'। এ ঘটনা বহু লোকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবে। কিন্তু নিউটনই প্রথম বর্ণালী সূত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন যে সাদা রং আসলে সাতটি রংয়ের মিশ্রণ মাত্র। ত্রিকোণ কাঁচ বিভিন্ন রংয়ের রশ্মিকে বিভিন্ন পরিমাণে বিচ্যুত করে দেয় এবং তারই ফলে সাদা রশ্মি বর্ণালীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কার্সফ. দেখিয়েছিলেন যে বিভিন্ন উপাদান উত্তেজিত হ'লে বিভিন্ন ধরণের বর্ণালী উৎপন্ন করে। আবার সাদা আলো কোন উপাদানের ভেতর দিয়ে এলে, সেই উপাদান নিজে উত্তেজিত হ'লে যে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো উৎপন্ন করতে সক্ষম, ঠিক সেই সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই শোষণ

করে নেয়। আবার কোন উপাদানের বর্ণালী তার আয়নিত অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এইভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ বিভিন্ন উপাদান চেনার কাজে, বিভিন্ন উপাদানের আয়নিত অবস্থার বিচারে ও যে সব অবস্থা এই আয়নিত অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের বিচারে, মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় বর্ণালী বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য পদ্ধতি। নিউটনই এই মূল্যবান পদ্ধতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করে নিউটন তার কণিকাতত্ত্ব প্রচার করেন। আলো হ'ল ছোট ছোট দ্রুতগতি কণিকার সমষ্টি। বিভিন্ন আকারের কণিকা বিভিন্ন রংয়ের সৃষ্টি করে। কোথাও ব্যাঘাত পেলে, কতগুলি কণিকা প্রতিফলিত ও কতগুলি পরিবর্তিত গতিতে প্রতিসরিত হয়। নিউটনের জীবিতকালেই অবশ্য হাইজেন্স্ তাঁর তরঙ্গতত্ত্ব প্রচার করে বলেন যে আলো ঈথর সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র। ঈথর হ'ল এমন এক কল্পিত সর্বব্যাপী পদার্থ যা বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট, অথচ পদার্থগত সকল গুণাগুন রহিত। তরঙ্গ তত্ত্বকে নিউটন গ্রহণ করেন নি। ঈথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ ছিল। পরে অবশ্য মহাকর্ষের বহুদূরের প্রভাব বোঝাতে গিয়ে তিনি সর্বব্যাপী ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কি তরঙ্গতত্ত্বে কি মহাকর্ষে ঈথরের কল্পনার কারণ ছিল। ডেকার্টেবাদীরা বলতেন যে পদার্থগত যোগাযোগ না থাকলে দূর-ক্রিয়া হ'তে পারে না। এই কার্টেসীয় দর্শন পরবর্তী যুগে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরে ফুকোর পরীক্ষা, আলোকমিশ্রণ, অপবর্তন ও সমবর্তন নিউটনের কণিকাতত্ত্বের বিরুদ্ধে রায় দেয় ও হাইজেন্সের তরঙ্গতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

রামধনুর প্রথম সুসঙ্গত ব্যাখ্যাও নিউটন দেন। সূর্য্য যখন দর্শকের পেছনে থাকে, তখন সূর্যরশ্মি দূরবর্তী বৃষ্টিকণায় প্রতিসরিত

ও প্রতিফলিত হয়ে বর্ণালী রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে দর্শকের চোখে আসে। জলকণিকার মধ্যে যে রশ্মি একবার মাত্র প্রতিফলিত হয় তার দ্বারা প্রাথমিক রামধনু গঠিত হয়। দুবার অন্তঃপ্রতিফলিত রশ্মির সাহায্যে মাধ্যমিক রামধনু তৈরী হয়। অবস্থা অনুকূল হ'লে আরও বহু রামধনু তৈরী হ'তে পারে। তবে এদের মধ্যে প্রথম রামধনুটিই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়। রামধনুর কেন্দ্র থাকে দর্শকসূর্য্যসমন্বিত সরলরেখার ওপরে। প্রাথমিক রামধনুর বেগুনী থাকে ভেতর দিকে আর লাল বাইরে। মাধ্যমিক রামধনুর থাকে লালটা ভেতর দিকে, বেগুনীটা বাইরে। নিউটন সব কিছুরই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন।

তখনকার দিনের দূরবীণ যন্ত্রের কাঁচে বর্ণ-অপেরণ খুবই বেশী পরিমাণে হ'ত। ফলে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট ও রঙীন হয়ে উঠ্‌ত, বস্তুর যথার্থ প্রতিরূপ হ'ত না। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এ্যাবার্ডিনের জেমস্ গ্রেগরী লেখেন যে দূরবীণের বস্তুপ্রান্তের উত্তল কাঁচের বদলে অবতল দর্পণ ব্যবহার করলে বর্ণ-অপেরণ কমান সম্ভব হ'তে পারে। নিউটন এই সমস্যা সমাধানে মন দেন ও প্রচলিত প্রতিসরণ দূরবীণের নমুনা তৈরী করতে সক্ষম হ'ন। ক্যালিফোর্নিয়ার উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণটি একটি প্রতিফলন-দূরবীণ। নিউটনই হ'লেন প্রতিফলন-দূরবীণের জনক। তাঁর তৈরী প্রথম প্রতিফলন-দূরবীণটি আজও রয়্যাল সোসাইটির কেন্দ্রীয় দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

অংকশাস্ত্রে নিউটনের গবেষণাও মূল্যবান। দ্বিপদ উপপাদ্য (বাইনোমিয়াল থিয়োরেম) তিনিই আবিষ্কার করেন। ১৬৬৪-'৬৫ তে ওয়ালিসের বই পড়ে তিনি $(y-x^২)^{\frac{১}{২}}$ এর শ্রেণী বার করার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। এই প্রচেষ্টার ফলই হ'ল দ্বিপদ উপপাদ্যের আবিষ্কার।

অন্তরকলন ও সমাকলন (ফ্লাক্সনাল্ ক্যাল্‌কুলাস্) আবিষ্কার

সম্বন্ধে নিউটনের জার্মান গণিতজ্ঞ লাইবনিজের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছিল। ডে-কার্টের জ্যামিতি ও পরিবর্তনশীল মান (ভেরিয়েবেল্ ম্যাগ্নিচুড্) সংক্রান্ত ধারণা গণিতে এক নতুন গবেষণার পথনির্দেশ কর্ছিল্। সীমাবদ্ধ রৈখিকের ক্ষেত্রফল বার করা অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। তাপশাস্ত্রে উষ্ণতার পরিবর্তনের হার, স্থিতি ও গতিশাস্ত্রে অবস্থান পরিবর্তনের হার, গতি-পরিবর্তনের হার, কাজের হার, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সমস্যা গণিতের কাছে নতুন অস্ত্রের দাবী জানাচ্ছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীর গণিতজ্ঞ ক্যাভালিয়েরি বল্লেন যে একটি রেখা অসংখ্য বিন্দুর সমবায়ে গঠিত, একটি তল অসংখ্য রেখার সমষ্টি মাত্র আর একটি আয়তন অসংখ্য তলের সমাবেশে গঠিত। গণিতজ্ঞদের চিন্তাধারা এই পথে অগ্রসর হয়ে চল্তে লাগ্ল। ওয়ালিস্ দেখালেন যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে অনন্ত সংখ্যক অতিক্ষীণ অংশের যোগফল হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এইভাবে কেপ্লার ও ডে-কার্টে থেকে সুরু করে ক্যাভালিয়েরি, ওয়ালিস্, ফার্মাট্, প্যাস্কেল্, ব্যারো, সকলের লেখার মধ্যেই অন্তরকলন ও সমাকলনের প্রাথমিক উপাদানগুলি জড় হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল আর এক পা এগিয়ে সাধারণ সূত্রগুলি আবিষ্কার করে সমসাময়িক বিজ্ঞানের একটি বিরাট চাহিদা মেটান। কে এই চাহিদা মেটালেন? নিউটন না লাইব্নিজ্? ইতিহাস এ সম্বন্ধে দুই শিবিরে বিভক্ত।

নিউটন ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দেই অন্তরকলন ও সমাকলনের সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করা হয়। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন নি। মাধ্যাকর্ষণ ও অন্যান্য হিসাব পত্রেও তিনি এই নতুন পদ্ধতি কোথাও ব্যবহার করেন নি।

লাইব্নিজ্ এ কাজে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে হাত দেন বলে প্রমাণ আছে। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্তরকলন ও সমাকলনের প্রাথমিক

সূত্রাবলী প্রকাশ করেন। লাইব্‌নিজের বই দেখার পরে নিউটন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তার নিজস্ব পদ্ধতির কিছু আভাস দিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে 'অপ্‌টিকস্' গ্রন্থের সংযোজিত অংশে তিনি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণী উপস্থিত করেন ও ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ সূত্রাবলী প্রকাশ করেন।

আবিষ্কারের সম্মান, প্রকাশের তারিখ দিয়েই ঠিক হওয়ার কথা। সে দিক দিয়ে লাইব্‌নিজেরই আবিষ্কারের সব সম্মান পাওয়ার কথা। কিন্তু নিউটনের পক্ষসমর্থকেরা বললেন যে লাইব্‌নিজ্‌ ১৬৭৩-'৭৬ এর লণ্ডন ভ্রমণের সময় নিউটনের কাগজপত্র দেখেছিলেন ও তার সাহায্যেই অন্তর ও সমাকলনের ধারণা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে লাইব্‌নিজের সমর্থকেরা বল্‌ল যে নিউটন স্বতন্ত্রভাবে কলন আবিষ্কার করেন নি, লাইবনিজের তত্ত্ব চুরি করে নিজের নামে চালাচ্ছেন। এ তর্কের কোন সর্বসম্মত সমাধান সম্ভব হয়নি। লাইবনিজ প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ ছিলেন। অন্তরকলন ও সমাকলন আবিষ্কার করার যোগ্যতার তাঁর অভাব ছিল না। অন্যদিকে নিউটনও বিরাট আংকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আপন আবিষ্কার প্রকাশে বহুদিন বিলম্ব করাও তাঁর স্বভাব ছিল। তাই সম্ভবত তাঁরা উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে এই আবিষ্কার করতে পেয়েছিলেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে লাইব্‌নিজের পদ্ধতি ও চিহ্নগুলিই ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। অন্তরকলন ও সমাকলনে আমরা লাইব্‌নিজের চিহ্ন ও পদ্ধতিই গ্রহণ করেছি, নিউটনের চিহ্নাদি সমার্থক হ'লেও আর ব্যবহৃত হয়না।

নিউটন ও লাইবনিজের মনোমালিন্য ও বাক্‌যুদ্ধ দেখায় যে খ্যাতির জন্য বৈজ্ঞানিকদের মনে কি অসীম আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই ঘটনা একথাও প্রমাণ করে যে যুগোপযোগী আবিষ্কার কোন বিশেষ আবিষ্কারকের মুখচেয়ে থাকে না। নিউটন প্রকাশে বিলম্ব করায়,

লাইবনিজ্ কলনের সূত্রাবলী আবিষ্কার করলেন। লাইবনিজ্ না করলে অন্য কেউ আবিষ্কার করতেন। গণিতের বিকাশের ধারা সমাজের বা বিজ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী কলনের নিয়মাবলীর প্রতিষ্ঠা কর্তই কর্ত। হয়ত একটু দেরী হ'ত, চিহ্নগুলি অন্যরকম হ'ত।

নিউটনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারণা হ'ল কণাবাদ। প্রাচীন দার্শনিকদের ধারণা অনুযায়ী নিউটন বায়বীয় পদার্থকে বহু কণার সমষ্টি বলে মনে করতেন। তিনি দেখান যে এই ধারণার ভিত্তিতে বয়েলের বিখ্যাত বায়বীয় পদার্থ সংক্রান্ত সূত্রের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। নিউটনের সাধারণ দার্শনিক বা ধর্ম্মীয় ধারণার সঙ্গে এই কল্পনার কোন মিল ছিল না। তবু বাস্তবের খাতিরে নিউটন এই অসঙ্গতি মেনে নিয়েছিলেন। বহুদিন পূর্বে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি বর্ণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে গ্যালিলিও জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে পার্থিব বলবিদ্যার (স্থিতি ও গতিশাস্ত্রের) যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে নিউটন সেই কাজই সম্পূর্ণ করলেন। মহাকর্ষের সাধারণ পটভূমিকায় তিনি তিনটি সুসংবদ্ধ গতিসূত্রের আলোচনা করলেন।

প্রথম—কোন বস্তুর ওপর বাইরের বল প্রযুক্ত না হ'লে তার স্থিতাবস্থা বা সরলরৈখিক পথের স্থিরগতিবেগ পরিবর্তিত হয় না।

দ্বিতীয়—ভরবেগের (ভর × গতিবেগ) পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের দিকেই হয় ও এই পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের আনুপাতিক হয়।

তৃতীয়—প্রত্যেক বলেরই বিপরীত ও সমান মানের প্রতিবল আছে।

প্রথম দু'টি সূত্র গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন। গতিপ্রবণতা ও স্থিতিপ্রবণতার ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন ডেকার্টে। নিউটন তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন মাত্র। তৃতীয় সূত্রটি নিউটনের নিজস্ব আবিষ্কার।

নিউটন জ্যোতিষ্কলোকের গতির সঙ্গে পার্থিব গতির ঐক্যসাধন করে সমগ্র বিশ্বকে এক বিরাট যন্ত্র হিসেবে দেখালেন। মহাকর্ষকে পদার্থের স্বাভাবিক গুণ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি দেবদূতদের বিশ্ব গতির জনকের আসন থেকে দূর করলেন। গ্রহরা স্পর্শকমুখী যে প্রথম বল পেয়েছিল, ভগবান কেবল সেইটুকুর জন্যই দায়ী রইলেন। তারপর বিশ্ব আপন পদার্থগত মহাকর্ষের নিয়মেই নিরন্তর গতিশীল হ'ল। ভগবান হয়ে গেলেন দয়াবান দর্শক মাত্র। বিশ্বগতিতে তার অবিরাম হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হ'ল। 'বিশ্বে যে যার আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক' এই নীতিবাক্য পরিত্যক্ত হ'ল। বলা হ'ল—'যারা নিজেরা চেষ্টা করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন।' বা

'উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি ॥'

নিউটনের সময়ে ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা ও শিল্পের বিকাশের ফলে দার্শনিক ও ধর্ম্মীয় ধারণায় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের পরিবর্তনশীল ধর্ম্মবিশ্বাসই ছিল নিউটনের দর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন নিউটনের সমগ্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দর্শনের আধারেই নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ উপস্থিত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সত্যে উপনীত হয়েও নিউটন আর্কিমিডিসের কায়দায় উপলব্ধ সত্যের সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিতে সত্য উদ্ঘাটন করে দেখালেন। এ ছিল নিউটনের দর্শনেরই প্রভাব।

নিউটনের ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা গণসংযোগের বিপজ্জনক পথ পরিত্যাগ করে জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে আপোষ কর্‌ছিল, রাজাকে নিজেদের সর্ত্তে সমর্থন কর্‌ছিল। তারা ভেবেছিল যে এইভাবে তারা ইংল্যাণ্ডে বিপ্লব সুসম্পূর্ণ করছে, এমন এক

কাঠামো গড়ে তুলেছে যা একেবারেই নিখুঁত, কোথাও চিঁড় খাওয়ার নয়। রাজা অবশ্য আর সেই আগের রাজা ছিলেন না। তিনি এখন আর পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রীসভার কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, যুক্তির বিরুদ্ধে কখনও যান না।

সমসাময়িক সমাজের এই সংগঠন দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তা-পরিকল্পনায় যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ওভারটুন বা লেভ্‌লারদের উগ্র বস্তুবাদ বড়লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। নিউটনের বস্তুবাদই তাদের রাজনৈতিক আপোষকে প্রতিফলিত কর্‌ল, তাদের সামাজিক পরিকল্পনার অনুরূপ বিশ্ব পরিকল্পনা হয়ে উঠ্‌ল। ব্যবসা ও ছোট ছোট শিল্পের অধীনে সমাজের পরিবর্তনের গতি অতি মন্থর বলেই বিশ্বের এই অপরিবর্তনশীল যান্ত্রিক ঐক্যের দুর্বলতা ধরা পর্‌ল না। নিউটনের বিশ্বপ্রেক্ষাই একশ বছরের বেশী সময় ধরে রাজত্ব কর্‌ল, বিজ্ঞানের বিকাশের পথ রোধ করে' রইল। ফরাসী ও জার্মাণ বস্তুবাদীরা নিউটনের বিজ্ঞান-দর্শনের ভিত্তিতেই নিজেদের মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। নিউটনের যান্ত্রিক বস্তুবাদের আধার থেকে বিজ্ঞান মুক্তি পেল শিল্প-বিপ্লবের যুগে—সমাজ যখন এক দ্রুত পরিবর্তন ও বিকাশের পথ নিল তখন। লাপ্‌লাসের বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্ব ও ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ এই দ্রুত উন্নতির যুগেরই ফল।

নিউটনের পদ্ধতির ত্রুটি কি? আজ পর্য্যন্ত যে পদ্ধতির সাহায্যে আমরা প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম চালাই, যন্ত্রপাতি তৈরী করি তার গলদ ছিল কোথায়?

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হার্শেল দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে একটি নতুন গ্রহ য়ুরেনাস আবিষ্কার করেন। য়ুরেনাসের কক্ষপথ মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী হিসেব করে বার করা হ'ল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা গেল যে অজানা কারণে এই কক্ষপথে নানা বিচ্যুতি দেখা দেয়। জে, সি, এ্যাডামস্ ও লাভেরিয়ার এই বিচ্যুতির

মহাকর্ষসূত্রসম্মত কারণ হিসেব করে নতুন গ্রহ নেপচুনের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎবাণী করলেন। বার্লিনের গেলি এই গ্রহটিকে খুঁজে বার করলেন। এর ফলে মহাকর্ষসূত্রেরই জয় জয়কার ওঠে। বুধগ্রহের কক্ষপথের ক্রমপরিবর্তনের ব্যাখ্যা অবশ্য মহাকর্ষ দিতে পারেনি। কিন্তু সেজন্য অন্তত দু'শ বছর কেউ মহাকর্ষসূত্রকে দোষী মনে করেনি।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ আছে। স্বতঃসিদ্ধ বলতে আমরা এমন সহজ সত্যকে বুঝি যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। ইউক্লিড্ এই রকমের কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধের ওপরে তার জ্যামিতির সৌধ গড়ে তুলেছিলেন। চার শ' বছর পরে টলেমী বলেছিলেন যে এগুলি আসলে স্বতঃসিদ্ধ নয়, কতগুলি অঙ্গীকার (এ্যাসামপ্‌সন্) মাত্র। এখন আমরা জানি যে ইউক্লিড্ যে ধরণের দেশে (স্পেস্) তার জ্যামিতি খাটে, এই স্বতঃসিদ্ধগুলির দ্বারা সেই দেশের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন মাত্র।

'প্রিন্সিপিয়া'তেও গতিসূত্রগুলি আলোচনা করার পূর্বে নিউটন কতগুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ উপস্থিত করেছিলেন। 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশের দু'শ বছর পরে, ভিয়েনার অধ্যাপক ই ম্যাক্ দেখান যে এই সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি আসলে কতগুলি অঙ্গীকার মাত্র—'প্রিন্সিপিয়া'র উপপাদ্যগুলি যে ধরণের পদ্ধতিতে প্রযোজ্য, এই অঙ্গীকারগুলি সেই পদ্ধতিরই বর্ণনা মাত্র।

প্রথমে নিউটন ভরের সংজ্ঞা দিয়েছেন। বলেছেন ভর=আয়তন ×ঘনত্ব। কিন্তু ভর÷আয়তন ছাড়া ঘনত্বের অন্য কোন সংজ্ঞা নেই। তাই ভরের সংজ্ঞা কিছু নেই। নিউটনের সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ এই যে প্রত্যেক বস্তুর একটা পরিমাণ আছে আর এই পরিমাণের বৈশিষ্ট্যগুলি ভরের বর্ণিত গুণাগুণ মাত্র। এই গুণাগুণের একটি হ'ল এই যে ভর গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না। কাউফ্‌ম্যান্, জে, জে,

টম্‌সন্‌, আব্রাহাম ও লোরেঞ্জ—ফিট্‌জেরাল্‌ডের ইলেক্‌ট্রণ সংক্রান্ত গবেষণা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ কর্‌ল যে ভর গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল। ফলে ভরের সংজ্ঞা বিশ্ব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা না হয়ে, নিউটনের পদ্ধতির বর্ণনামাত্র হয়ে রইল।

গতিবেগ মাপার ব্যাপারেও নিউটনের পদ্ধতি এক সংকটের সৃষ্টি করে। কোন বস্তুর গতিবেগ মাপতে হ'লে আমাদের কোন নির্দিষ্ট স্থির বিন্দুর প্রয়োজন হয়। জ্যোতিষ্কলোকের সকলেই যদি গতিশীল হয় তো কোন বস্তুর পরমগতি মাপা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। নিউটন বললেন যে বিশ্বের গভীর প্রদেশে বিরাটাকার নিশ্চল বস্তুপিণ্ড আছে। তাদের তুলনায়ই আমরা বস্তুর গতিবেগ বিচার করতে পারি। এই 'বিরাটাকার নিশ্চল বস্তুপিণ্ডে'র ধারণার কোন ভিত্তি নেই। এই ধারণার দুর্বলতার কথা নিউটনের নিজেরও অজানা ছিল না। কিন্তু তাঁর দর্শন ও যান্ত্রিক পদ্ধতির লৌহন্যায় তাকে এই পরম স্থিতি পরম গতির ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। অথচ 'পরম স্থিতি ও পরম গতি বলে' কিছুর ধারণা সম্ভব নয়। তাই ভরবেগের সংজ্ঞাও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সময় সম্বন্ধেও নিউটনের সংজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত নয়। তিনি বলেছিলেন —'সময় বহিঃপ্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে সমভাবে অতিবাহিত হয়।' এটা সংজ্ঞা নয়, সময়ের একটা ধর্ম্ম মাত্র। তাও আবার সঠিক ধর্ম্ম নয়।

দ্বিতীয় গতিসূত্র বল সম্বন্ধে এক ধারণা উপস্থিত কর্‌ল। কিন্তু বলের সংজ্ঞা নিউটন দিতে পারলেন না। বড়জোর বলা গেল যে বল ভরবেগে পরিবর্তন এনে দেয় ও ভরবেগের পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের সঙ্গে অনুপাত সম্পন্ন হয়। তাই দ্বিতীয় সূত্রকে বড়জোর 'বলের পরিমাণের সংজ্ঞা' হিসেবে দেখা যায়।

বিশ্বে দু'টি বস্তু পরস্পরকে কেন আকর্ষণ করে তারও কোন ন্যায্য ব্যাখ্যা নিউটনের সময়ে বা পরবর্তীকালে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যতই

দিন যেতে লাগল, নতুন নতুন আবিষ্কার, বিশেষ করে পরমাণুজগতের যুগান্তকারী আবিষ্কার যতই প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল, নিউটনের পদ্ধতির বৈষম্য ও দুর্বলতা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বোঝা যেতে লাগল যে নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব সমগ্র বিশ্ব জগতের সঠিক সত্য নয়। পদার্থের গতিবেগ যখন অল্প থাকে, তখন তাদের গতির মোটামুটি হিসেব মেলানর সূত্র হিসেবে মহাকর্ষতত্ত্বকে দেখা যেতে পারে। মহাকর্ষতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের 'আংকিক সম্ভাবনার একটি চমৎকার চিত্র মাত্র।'

যেসব যুগান্তকারী আবিষ্কার নিউটনের মহাকর্ষপদ্ধতির অন্তর্বৈষম্যগুলিকে স্পষ্ট করে তুল্‌ল তাদের কথাই আমরা এখন আলোচনা কর্‌ব। আমরা দেখব যে আর এক যুগান্তকারী সামাজিক—রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জার্ম্মাণীর একজন ইহুদী বিজ্ঞানী কী ভাবে আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার কর্‌লেন, নিউটনের পদ্ধতির পরিবর্তে এক নতুন সামগ্রিক বিশ্বপদ্ধতি উপস্থিত করে বিজ্ঞানে নতুন বিপ্লব এনে দিলেন।

আট

আলবার্ট আইনষ্টাইন

এলার ও দানিয়ুব নদীর সঙ্গমস্থলে জার্ম্মানীর ভলম্ সহর অবস্থিত। এইখানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ আলবার্ট আইনষ্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। আলবার্টের পিতা হারম্যান আইনষ্টাইনের একটি ছোট কারখানা ছিল। তাই চালিয়ে এই ইহুদী পরিবারটির কোনমতে দিন চলত। ইহুদী হ'লেও ধর্ম্মের কোনো গোঁড়ামি এদের ছিল না। খৃষ্টানদের সঙ্গে এরা অবাধে মেলা-মেশা করতেন। এই পরিবারে বড় হয়ে আলবার্ট ও চিরদিন সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করে গেছেন।



আলবার্ট আইনষ্টাইন

কারখানা তেমন ভাল না চলায় হারম্যান্ মিউনিক সহরে গিয়ে নতুন করে কারখানা বসালেন। মিউনিকের স্কুলেই আলবার্ট প্রথম শিক্ষালাভ করতে আরম্ভ করেন। লেখাপড়ায় তিনি তেমন সুবিধা করতে পারতেন না। তবে অংকশাস্ত্রে, দর্শনবিদ্যায় ও বেহালাবাদনে তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যেত।

হারম্যান্ ব্যবসায় সুবিধা করতে না পেরে মিউনিক থেকে মিলান, মিলান থেকে পাভিয়া গেলেন। আলবার্ট ইতিমধ্যে স্কুল ছেড়েছেন। তাড়াতাড়ি যাতে রোজগার করতে শেখেন এইজন্য তাঁকে জুরিখের

পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয়ে ভর্তি করানর চেষ্টা হ'ল। কিন্তু আজ শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে আলবার্ট সেখানকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। তাই আবার তাঁকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি হ'তে হ'ল। কয়েক বছর পরে অবশ্য তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করলেন ও পলিটেক্‌নিকে ভর্তি হ'লেন। পড়াশুনার জন্য আলবার্টের যত টাকা লাগত তা দেওয়ার সাধ্য তাঁর পিতার ছিলনা। তাই আল-বার্টকে আত্মীয় স্বজনদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে ও টানাটানি করে চালাতে হ'ত। এই সাদাসিধা জীবনযাত্রার আদর্শ উত্তরকালেও তিনি কখনও ত্যাগ করেননি। অর্থের জন্য কোনদিন তাঁর লোভ দেখা যায়নি।

পলিটেকনিকের ছাত্র হিসেবে আইন্‌ষ্টাইন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গাইসার ও গণিতজ্ঞ মিন্‌কোভ্‌স্কির সংস্পর্শে আসেন। মার্সেল গ্রস্‌ম্যান্, ফ্রেডরিক অ্যাড্‌লার ও মিলেভা মারিৎস্ আইন্‌ষ্টাইনের সঙ্গে পড়তেন। অ্যাড্‌লার আইন্‌ষ্টাইনকে সমাজতন্ত্রী ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। মার্সেল গ্রসম্যান্ ও মিলেভা পরবর্তীকালে আইনষ্টাইনকে আংকিক হিসাবপত্রে খুবই সাহায্য করেছিলেন। মিলেভা, আলবার্ট আইন-ষ্টাইনের জীবনসঙ্গিনীও হয়েছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে, একুশ বছর বয়সে আইনষ্টাইন পলিটেক্‌নিক্ থেকে পাস করে বেরোলেন। এই সময়ে জার্ম্মানীতে ইহুদীবিদ্বেষ ছিল অতি তীব্র। পলিটেকনিকে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাতে একটি অধ্যাপনার আসন তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী হওয়ার অপরাধে অনেক চেষ্টাতদ্বির করেও কাজটি তিনি পেলেননা। কিছুদিন অনিশ্চিত অবস্থায় এখানে ওখানে টিউসনি করে তাঁর দিন কাটল। শেষে মার্সেল গ্রস্‌ম্যানের বাবার চেষ্টাতদ্বিরের ফলে তিনি জুরিখের সরকারী পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট পরীক্ষা করার একটা কাজ জোগাড় করলেন। এর অল্পদিন পরেই তিনি খুসী মনে মিলেভাকে বিয়ে

করেন। এই জীবন নিয়েই তিনি খুসী হ'লেন। অবসর সময়ে অবশ্য বিজ্ঞানচর্চা করতেন।

অফিসে কাজ ছিল কম, অবসর ছিল প্রচুর। কিন্তু অফিসের বুড়ো কর্তা ছিলেন বড় কড়া। অফিসে বসে অন্য কাজ করতে দেখলে ক্ষেপে যেতেন তিনি। তিনি জানবেন কেমন করে যে তাঁর অফিসের সামান্য একজন লোক তাঁর টেবিলে বসে যেসব হিসাবপত্র করছেন তাতে এক যুগান্তকারী মতবাদ জন্ম নেবে, এই মতের আবিষ্কর্তা ঘোষিত হ'বেন এক ক্ষণজন্মা পুরুষ বলে! তাই তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আইনষ্টাইনকে তাঁর পায়ের শব্দ ভাল করে চিনে রাখতে হয়েছিল। সেই শব্দ শোনা গেলেই আইন্‌ষ্টাইনের টেবিলের সব কাগজপত্র দেরাজের মধ্যে চলে যেত আর সেখানে দেখা যেত অফিসের কাজের নানা ফাইলপত্র।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সের এক যুবক বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্র 'আন্নালেন দের ফিজিক্' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে বললেন—

'আমার লেখা একটি প্রবন্ধ এনেছি। আপনারা ছাপলে ভাল হয়।'

'কোথায় কাজ করেন আপনি?'

'জুরিখের পেটেণ্ট অফিসে।'

এইভাবে আইন্‌ষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্র' প্রকাশিত হ'ল। এই বিশেষ সূত্র ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ সূত্র' ও 'সমন্বিত ক্ষেত্রের মতবাদ' হ'ল আইনষ্টাইনের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আবিষ্কার। বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণায় এই মত ওলট পালট এনে দিল, বহু অন্ধকার প্রকোষ্ঠকে আলোয় ভরে দিল, অনেক রহস্যময় ঘটনার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিল। আপেক্ষিকতাবাদ নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন ও দুর্বোধ্য। এই মতবাদ সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করব।

নিউটনের সময় থেকেই ঈথরের কল্পনা বিজ্ঞানে স্থানলাভ করেছিল। ডেকার্টে বলতেন যে পদার্থ-মাধ্যম না থাকলে দূরক্রিয়া হ'তে পারেনা। মাধ্যাকর্ষণ বহুদূরে শূন্যলোকের মাধ্যমের ভেতর দিয়ে কাজ করে। তাই কল্পনা করা হ'ল যে এই শূন্যলোক প্রকৃতপক্ষে শূন্য নয়, ঈথরে পরিপূর্ণ। পরে যখন আলোকতরঙ্গের জন্যও এক মাধ্যম দরকার হ'ল তখন ঈথর কল্পনা এক সুনির্দিষ্ট রূপ পেল। বলা হ'ল যে আলোক, উত্তাপ ইত্যাদি যে কোন তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ ঈথরের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

এই ঈথরের গুণাগুন কি? দেখা গেল যে বস্তুর কোন গুণই ঈথরের নেই। ঈথর জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপী, পদার্থের সকল গুণ রহিত। সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ঈথরের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব হ'ল না। অথচ তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ শূন্যমাধ্যমের ভেতর দিয়েই সঞ্চারিত হয় একথাও কেউ ভাবতে পারলেন না। তাই ঈথর পরিকল্পনা দিয়ে তারা তাদের চিন্তার অসঙ্গতি মেটালেন। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হ'ল যে কোন ঘটনার কারণ না বুঝতে পারলেই সেটা ঈথরের জন্য, এই কথা বলা হ'তে লাগল। জেম্স্ জীন্সের ভাষায় 'বিজ্ঞানে যতগুলি অমীমাংসিত সমস্যা ছিল ততগুলি ঈথরের পরিকল্পনা করা হ'ল।'

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ক্লীভল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেল্সন ও মর্লে ঈথরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এক সুচিন্তিত পরীক্ষা কার্য্য চালান। পৃথিবী ঈথর-আবৃত। সাইকেলে করে দ্রুতবেগে চললে আরোহীকে বিরুদ্ধ বায়ু প্রবাহের প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। তাই মনে করা হ'ল যে গতিশীল বিশ্বও ঈথর সমুদ্রে তেমনি ঈথর প্রবাহের সৃষ্টি করবে। বীজগণিতের সাধারণ হিসাবের সাহায্যেই দেখান যায় যে গতিশীল নদীর স্রোত ধরে ও পরে স্রোতের বিরুদ্ধে a পথ যেতে ও

আসতে মোট সময় লাগে $t_1 = \frac{2ac}{c^2 - v^2} = \frac{2a}{c\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$ এখানে c হ'ল সাঁতারুর ও v নদীপ্রবাহের গতিবেগ। আবার স্রোতের আড়াআড়ি a পথ যেতে ও আসতে সময় লাগে $t_2 = \frac{2a}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2}{c\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}}$ a যদি v এর চেয়ে বড় হয় তো t_1 ও t_2র চেয়ে বড় হবে। আবার

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

মাইকেলসন্-মর্লে দু'টি আলোক রেখাকে একই বিন্দু থেকে যাত্রা করিয়ে দু'টি আড়াআড়ি দিকে একই দূরত্বে যেতে ও সেখান থেকে ফিরে আসতে দিলেন। এক্ষেত্রে c হবে আলোকের গতি। v পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি বলতে আমরা কি বুঝব? আহ্নিক গতি না বার্ষিক গতি না সৌরমণ্ডলের সাধারণ গতি? কোনটাই নয়। vকে বলা হ'বে ঈথর সমুদ্রে পৃথিবীর পরম গতি, যা পৃথিবীর সকল গতির সমন্বয়ের ফল।

মাইকেলসন্-মর্লে আশা করেছিলেন যে দু'টি প্রত্যাগত রশ্মি যেতে-আসতে বিভিন্ন সময় নিয়েছে বলে তাদের কলার পার্থক্য ঘটবে ও তাদের মিশ্রণের ফলে যে রেখাচিত্র পাওয়া যাবে তাতে পরপর আলোকিত ও অন্ধকার রেখা থাকবে। এই চিত্রের সাহায্যে $\frac{t_1}{t_2}$ হিসেব করে বার করা যাবে। আবার $\frac{t_1}{t_2} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}}$ অর্থাৎ $\frac{t_1}{t_2}$ ও আলোর গতিবেগ c জানা থাকলে, পৃথিবীর পরম গতি v বার করা যাবে।

বার বার বিভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা চালিয়েও মাইকেলসন্-মর্লে মাথা নাড়লেন। t_1 ও t_2 বার বার সমানই হ'ল। অর্থাৎ ঈথরের অস্তিত্ব কিছুতেই প্রমাণ করা গেল না। অবশ্য বলা যায় যে পৃথিবী

ঈথর সমুদ্রে স্থির হয়ে আছে, অর্থাৎ $v=o$, কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি তো সুপ্রমাণিত সত্য। তা হ'লে উপায় কি ? কি ভাবে এই সংকটজনক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া হ'বে ?

হারলেমের লোরেন্‌জ্ ও ডাবলিনের ফিট্‌জেরাল্ড্ এই পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন যে কোন বস্তু গতিশীল হ'লে গতির দিকে তার দৈর্ঘ্য কমে যায়। অর্থাৎ যদিও পৃথিবী ঈথরের মধ্য দিয়ে চলেছে বলে t_1 ও t_2 ভিন্ন হওয়ার কথা, কিন্তু যেদিকে পৃথিবী চলেছে সেদিকে আলোর পথও গেছে কমে, ফলে t_1 ও t_2 সমান হয়ে যাচ্ছে। এই দৈর্ঘ্য হ্রাস লোরেন্‌জ-ফিট্‌জেরাল্ড সঙ্কোচন নামে পরিচিত।

এ ধরনের দৈর্ঘ্যহ্রাস সত্যই ঘটে কিনা তা বোঝার কিন্তু উপায় নেই। কারণ যে কোন মাপার দণ্ডই একই গতির অধিকারী বলে সমান সঙ্কোচনের অধীন হ'বে।

ফরাসী গণিতজ্ঞ পয়েনকের্ কথা তুললেন যে এ কেমন ব্যাখ্যা হ'ল ? গতির দিকে দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হয় ধরে নিলে $t_1=t_2$ হয় বলেই সঙ্কোচন হয় একথা মানব কেন ? পরীক্ষার ফল যে প্রতিজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় সেই কল্পনাকেই বিশ্বের নিয়ম বলে গ্রহণ করা হ'বে কেন ? লোরেন্‌জ এই আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখালেন যে পদার্থের আণবিক গঠনের সাহায্যে এই সঙ্কোচনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লোরেন্‌জ আরেকটি আপাতদুর্বোধ্য গাণিতিক হিসেব বার করলেন। তিনি বললেন যে ঈথরে স্থিরনিবদ্ধ তিনটি অক্ষকে যদি x, y, z বলা হয় ও পৃথিবীর সঙ্গে লাগান তিনটি অক্ষকে যদি x', y', z' বলা হয় তা'হ'লে তড়িৎচুম্বক ঘটনাবলী এক অক্ষদেশ থেকে অন্য অক্ষদেশে নিয়ে যেতে হ'লে কতগুলি সমীকরণ পাওয়া যায়। এই সমীকরণের মধ্যে কতগুলি সহজে বোঝা গেল। কিন্তু শেষ সমীকরণটি বড়ই গোলমালের সৃষ্টি করল।

সেটি দেখল যে x, y, z অক্ষদেশের কোন কাল t ও x', y', z' অক্ষ-দেশের অন্য কোন কাল t' হওয়া সত্ত্বেও $t = t'$, অর্থাৎ দু'টি ভিন্ন অক্ষ-দেশের ভিন্নমানের দু'টি সময় প্রকৃতপক্ষে একই সময়কে নির্দেশ করছে। এই বিচিত্র সমীকরণের পদার্থবিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা লোরেন্জ দিতে পারলেন না।

এই সংকটে একজন পেটেণ্ট পরীক্ষক এগিয়ে এলেন। তিনি প্রথমেই যা বললেন তা অতীব চমকপ্রদ। তিনি বললেন যে পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলিতেই বহু গলদ আছে। এই সংকটে পথ পেতে হ'লে বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলিকেই বিচার করে দেখতে হ'বে।

দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের ধারণা পদার্থবিজ্ঞানের মূল বলা চলে। এদের এককের ওপরই অন্যান্য সব একক নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য, সময় ও ভর সম্বন্ধে নিউটনীয় বলবিদ্যা যে ধারণা গড়ে তুলেছিল আইনষ্টাইন তা পুনরায় বিচার করে দেখতে চাইলেন।

ভর সম্বন্ধে ধারণা ছিল এই যে ভর পদার্থের একটি অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য। পদার্থের গতিস্থিতির ওপর ভর নির্ভর করেনা। ভর = ঘনত্ব × আয়তন, এই হ'ল ভরের একমাত্র নিউটনীয় সংজ্ঞা। আয়তন না হয় বোঝা গেল যে তিনটি দৈর্ঘ্যের গুণফল। কিন্তু ঘনত্ব কি? না ঘনত্ব = ভর ÷ আয়তন। অর্থাৎ ভর বোঝাতে ঘনত্ব ব্যবহার করা হয় ও ঘনত্ব বোঝাতে ভর। কোনটিরই সঠিক ও স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নিউটনীয় বিজ্ঞান দেয়নি। কাজেই ভর সম্বন্ধে নিউটনীয় ধারণা কোন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এমন বলা চলেনা। কাউফ্ম্যান্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দ্রুতগতি ইলেকট্রণ বা ঋণকণা নিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ইলেকট্রণের ভর অপরিবর্তনীয় কিছু নয়, এই ভর তার গতির ওপর নির্ভরশীল। ইলেকট্রণকে ক্ষুদ্রতম পদার্থকণা মনে করলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়ে ওঠে যে পদার্থের ভর তার গতির

ওপর নির্ভর করে। এর ফলে ভরের নিউটনীয় ধর্ম্ম একেবারেই অবলুপ্ত হ'য়ে যায়।

লোরেন্‌জের গতির দিকে দৈর্ঘ্য-সঙ্কোচনের মতবাদ, দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে পুরোণো বলবিদ্যার ধারণা বদলে দিতে চাইল, দেখাল যে দৈর্ঘ্য গতির ওপর নির্ভরশীল। তাই আইনষ্টাইন দৈর্ঘ্যের ব্যাপারটাকেও একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে চাইলেন।

সময় সম্বন্ধে পুরোণো ধারণা ছিল এই যে সে সকল বস্তুকে অতিক্রম করে' নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে পরম অতীত থেকে পরম বর্তমান হয়ে' পরম ভবিষ্যতের দিকে। এটা প্রকৃতপক্ষে সময়ের কোন সংজ্ঞা নয়, একটি ধর্ম্ম মাত্র, তাও সঠিক ধর্ম্ম নয়।

গতি সম্বন্ধে নিউটনীয় ধারণাও ত্রুটিপূর্ণ। গতি সম্বন্ধীয় ধারণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনকে ধরে নিতে হয়েছিল যে তারকামণ্ডলীর গভীরে কোন এক দূরতম দেশে এক নিশ্চল বস্তুপিণ্ড বর্তমান, যার তুলনায় সকল বস্তুর গতি বা পরম গতির বিষয় আমরা আলোচনা করি। অথচ নিউটন নিজেও জানতেন আর আমরাও জানি যে বিশ্বে এমন নিশ্চল বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই। তাই পরম গতি এক অবাস্তব বস্তু। অথচ এই অবাস্তবতাই নিউটনীয় বলবিদ্যার অন্যতম ভিত্তি।

নিউটনীয় ধারণার এই রকম বিচার করে আইনষ্টাইন সময় ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটি সরল অথচ সুদূরপ্রসারী আলোচনা করলেন।

মনে করা যাক যে পৃথিবীর বার্ষিকগতির সময় ধরে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যের দূরত্ব বদলায়না। এই দূরত্ব কত মাইল না বলে আমরা বলতে পারি যে দূরত্ব আলোর ৮ মিনিটের পথ (দূরত্ব=৮ × ৬০ × ১, ৮৬,০০০মাইল)। ধরা যাক্ যে সূর্য্যে একজন মানুষ আছে ও পৃথিবীতে আর একজন মানুষ আছে। সূর্য্যে অবস্থিত দর্শকের ঘড়িতে বেজেছে সকাল ৬টা। সে বেতার সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীর দর্শককে জানাল যে এখন সকাল ৬টা বাজে। এই খবর কিন্তু বেতারের

গতিবেগের জন্য (আলোর গতিবেগের সমান) পৃথিবীতে পৌঁছোবে সকাল ৬টা ৮ মিনিটে। তাই সংকেত পৌছোবার মুহূর্ত্তে যদি পৃথিবীর দর্শকের ঘড়িতে সকাল ৬টা ৮ মিনিট হয়ে থাকে তো বোঝা যাবে যে দুই দর্শকের ঘড়ি মেলানই আছে। পৃথিবীর দর্শক সংকেত পাওয়া মাত্র পাল্টা সংকেতে জানাল যে তার ঘড়িতে সকাল ৬টা ৮ মিনিট বাজে। সূর্য্যের দর্শক এই পাল্টা সংকেত ৬টা ১৬ মিনিটে পেয়ে তার নিজের ঘড়ি মেলাতে পারবে। এই ভাবে বহু সংকেতবিনিময়ের সাহায্যে দুই দর্শক তাদের সময় মিলিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু গ্রহদের নিয়ে সূর্য্য যদি কোনদিকে গতিশীল হয় তো ব্যাপারটা অন্য রকম হ'বে। মনে করা যাক্ যে সূর্য্য-পৃথিবী সমন্বয় সূর্য্যের যেদিকে পৃথিবী সেইদিকে ধেয়ে চলেছে। সূর্য্যের দর্শক সকাল ৬টায় সংকেত পাঠাল। সংকেত তরঙ্গ যেদিকে যাচ্ছে পৃথিবীও সেদিকে ধাবমান বলে' এই সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছোতে ৮মিনিটের বেশী সময় নেবে, ধরা যাক ৯মিনিট নেবে। তা হ'লে সংকেত পৃথিবীর দর্শক পেল ৬টা ৯মিনিটে। তখন সে তার ঘড়িতে ৬টা ৯মিনিট করে' পাল্টা সংকেত পাঠাল। সূর্য্যের দর্শক এখন সংকেতের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই সংকেত এবার সূর্য্যে পৌঁছোতে ৮মিনিটের কম সময় নেবে, ধরা যাক ৭মিনিট নেবে। সূর্য্যের দর্শক তা হ'লে এই সংকেত পাবে ৬টা ১৬মিমিটে। তখন সে তার ঘড়ি মেলাতে পারবে। কিন্তু এইভাবে ঘড়ি মেলান সম্ভব হ'বে তখনই যখন জানা থাকবে যে সূর্য্য-পৃথিবী সমন্বয়ের পরমগতির জন্য সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলোর আসতে সময় লাগবে ৯মিনিট অথচ পৃথিবী থেকে সূর্য্যে যেতে লাগবে ৭মিনিট। কিন্তু পরমগতি সম্বন্ধে সজ্ঞান না হ'য়ে ও পরমগতির পরিমাণ না জেনে এই সময় জানা যাচ্ছেনা। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লে'র পরীক্ষা দেখাল যে পরমগতি বার করার কোন উপায় নেই, পরমগতি সম্বন্ধে কোন দর্শক সচেতন হ'তে পারেনা। তাই সূর্য্য থেকে যে দর্শক ৬টায়

সংকেত পাঠাল সে মনে করবে যে তার সংকেত পৃথিবীতে ৬টা ৮ মিনিটে পৌঁছেছে। তবু পৃথিবীর দর্শক ৬টা ৯মিনিটে সংকেত পাঠাল কেন একথা ভেবে সে অবাক হ'বে। পরম গতি সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে সে ভাববে যে পৃথিবীর দর্শকের ঘড়ি এক মিনিট ফাষ্ট চলছে। পৃথিবীর দর্শক যদি সূর্য্যের দর্শকের পরামর্শ মত তার ঘড়ি ১ মিনিট পিছিয়ে দেয় তো সময় সম্বন্ধে দু'জনের মতভেদ কিছু থাকবেনা, কিন্তু দু'জনের সকাল ৬টা একই সময়কে নির্দেশ করবেনা।

এই বিচার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কোন গতিসম্পন্ন বস্তুর দুইপ্রান্তে অবস্থিত দুই দর্শক সময় সম্বন্ধে কখনও একমত হ'তে পারেনা। একজনের ৬টাকে অন্যজন ৬টা বলে মেনে নিতে পারেনা। অথবা দু'জনে একমত হ'লে ও দু'জনের ৬টা একই সময়কে নির্দেশ করতে পারেনা। বর্তমান মুহূর্ত্ত এক এক দর্শকের কাছে এক এক রকম হয়। একেই বলা হয় আপেক্ষিকতাবাদের বর্তমান মুহূর্ত্ত সম্বন্ধীয় ধারণা (আইডিয়া অব্ সাইমালটেনিটি)।

সময় সম্বন্ধে এই চিন্তাধারা বিশ্বের সর্বত্র প্রযোজ্য, কেননা বিশ্বের সকল পদার্থই নিরন্তর গতিশীল। পরমকালের ধারণা এই বিচারের ফলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কোন দর্শকের মতকেই অন্য কোন দর্শকের মতের তুলনায় শ্রেয়ঃ বলা চলেনা। সকলের অভিমতই সমান মূল্যবান।

সময় সম্বন্ধীয় এই বিচার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা চলে। মনে করা যাক যে এক রেলগাড়ীর দুইপ্রান্তে দু'জন দর্শক আছে। তাদের দু'জনের কাছে ঘড়িও আছে। এই ঘড়ি দু'টি ওপরে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে তারা মিলিয়ে নিয়েছে। তাই একমত হ'লেও দু'টি ঘড়িতে ৬টা বাজলেই যে উভয় স্থানে এক সময় নির্দেশিত হয়না তা ত'ারা জানেনা। ষ্টেসনের প্লাট্‌ফর্মের ওপরে আরো দু'জন দর্শক রয়েছে। তাদেরও পরস্পর থেকে কিছু দূরত্বে বসে মেলান দু'টি ঘড়ি আছে। এরা জানে যে রেলগাড়ী চলছে বলে সেই গাড়ীর দুইপ্রান্তের দুই

দর্শকের ঘড়ির একই সময় প্রকৃতপক্ষে একই কালকে নির্দেশ করেনা। কিন্তু তারা আবার পৃথিবীর গতির সম্বন্ধে সজ্ঞান নয় বলে ভাবে যে তাদের ঘড়ি ঠিকই মেলান আছে, কোন গরমিল তাতে নেই। এইভাবে কারো ঘড়িই প্রকৃতপক্ষে অন্যের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মিলিয়ে রাখা হয়েছে মনে করলেও ঘড়িগুলির এক সময় একই কাল বোঝায়না।

রেলটির দৈর্ঘ্য মাপতে হ'লে একই সময়ে রেলের সামনের মাথার জন্য ও পেছনের প্রান্তের জন্য একটি করে দাগ দিয়ে, এই দাগ দু'টির মধ্যের দূরত্ব মাপতে হ'বে। দাগ দু'টি যদি রেলের দর্শক দু'জন দেয় তো সে দাগ ষ্টেশনের লোকেরা মানবেনা, তারা বলবে যে রেলের গতির জন্য ওদের ঘড়ির মিলে গণ্ডগোল আছে তাই যে দাগ দু'টি ওরা একই মুহূর্ত্তে দিয়েছে বলে মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে একই মুহূর্ত্তে দেওয়া হয়নি। আবার দাগ দু'টি যদি ষ্টেশনের লোকেরা দেয় তো পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে সচেতন দর্শক বলবে যে তাদের দাগ দু'টিও এক সময়ে দেওয়া হয়নি। এইভাবে দৈর্ঘ্য অবশ্যই গতির ওপর নির্ভর করবে। দৈর্ঘ্য বস্তুর কোন অবিচলিত গুণ হ'তে পারে না।

অনুরূপ বিচারের সাহায্যে আইনষ্টাইন দেখালেন যে ভরও বস্তুর কোন অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য নয়, ভরও গতি বাড়লে বেড়ে যাবে, গতি কমলে কমবে। এইভাবে আইনষ্টাইন নিউটনের কাল, দৈর্ঘ্য ও ভর সংক্রান্ত ধারণার ত্রুটি খুলে দেখালেন; বললেন যে গতিশীল বিশ্বে এই কাল, দৈর্ঘ্য ও ভর সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শক যে সব বিভিন্ন মতামত পোষণ করবে, তার কোন একটি মতকে অন্য একটি মতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া চলে না।

মাইকেলসন-মর্লে'র পরীক্ষার পরে বলা হয়েছিল যে পরমগতিকে প্রকাশ না করার জন্য প্রকৃতি এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। আইনষ্টাইন

বললেন যে এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে প্রকৃতির কোন অনাবিষ্কৃত ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এখানে কাজে করছে। তিনি বললেন যে পরীক্ষার ফলকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আমরা দু'টি অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারি।

(১) কোন পরীক্ষার সাহায্যেই পরমগতি নির্ধারণ সম্ভব নয়।

(২) আলোর গতিবেগ ধ্রুব ও বিশ্বজগতের সর্বোচ্চ গতিবেগ এবং এই গতিবেগ আলোর উৎপত্তিস্থলের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না।

তা হ'লে কোন বস্তুর পক্ষেই আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

এই দু'টি সহজ অঙ্গীকারই হ'ল আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্রের ভিত্তি। এর সাহায্যে তিনি লোরেন্‌জ-সঙ্কোচন ও অক্ষ-পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর ব্যাখ্যার ফলে একথা স্পষ্ট হ'ল যে দৈর্ঘ্যের মাপ অক্ষ-পদ্ধতির গতির ওপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ অক্ষপদ্ধতির পরিমাপকে আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন অন্যান্য অক্ষপদ্ধতির মাপের তুলনায় প্রাধান্য দেওয়া চলে না।

কিন্তু যে যার মাপ নিয়ে থাকলেও আলোকগতির সূত্র বা প্রকৃতির কোন অপরিবর্তনীয় সূত্র সকলের কাছে একই মনে হয়। সময় ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একমত না হ'লেও আলোকগতির সমীকরণকে তারা একইভাবে লিখবে। এই সিদ্ধান্তেরই তিনি নাম দিলেন 'আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্র।'

—যদি একটি অক্ষপদ্ধতি অন্য আর একটি অক্ষপদ্ধতির তুলনায় স্থিরগতিতে সঞ্চারমান হয় তো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাবলী দুই অক্ষপদ্ধতিতে একই হ'বে।

আমরা বলতে পারি যে চলন্ত ট্রেনে আবদ্ধ কোন পরীক্ষার সাহায্যে ট্রেনের গতি ধরা পড়তে পারে না। কোন প্রস্তরখণ্ডকে ট্রেনের মধ্যে

ছুঁড়ে মার্‌লে সে অধিবৃত্তাকার পথেই পড়বে, ঠিক যেমন মাটিতে দাঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে মার্‌লে হয়। প্রস্তরখণ্ডের অধিবৃত্তাকার পথের সূত্র পৃথিবীর সঙ্গে আবদ্ধ অক্ষপদ্ধতির তুলনায় গতিশীল ট্রেণের অক্ষ-পদ্ধতির গতির ওপরে নির্ভর করে না। এও আপেক্ষিকতাবাদ হ'ল বটে। কিন্তু আইনষ্টাইন্ এই পুরোণো ধারণাকে আলোক ও অন্যান্য তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গ সম্বন্ধে সত্য বলে প্রমাণ করলেন। সময় ও দৈর্ঘ্যের প্রাচীন ধারণার সংস্কার ছাড়া এ কাজ সম্ভব হ'ত না।

আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্র পরম স্থিতি, পরম গতি ও পরম কালের ধারণাকে বিদায় দিল ও মাইকেল্‌সন-মর্লে পরীক্ষার সহজ ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিল। দু'টি সহজ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার পুরোণো ধারণার সংস্কার করলেন আইন্‌ষ্টাইন্। সময়, দৈর্ঘ্য ও ভরের ধারণায় পরিবর্তন এল। বিশেষ সূত্র দেখাল যে ভর গতির ওপর নির্ভরশীল।

$m=\frac{mo}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$, mo যদি স্থির-ভর হয় তো v গতিবেগে

ভর হবে m। c আলোকের গতি। এইভাবে আইন্‌ষ্টাইন কাউফ্‌ম্যান প্রমুখদের ইলেকট্রণের ভর-পরিবর্তন সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিলেন। আবার গতির পরিবর্তনে ভরের পরিবর্তন প্রাচীন বিজ্ঞানের 'ভরের সংরক্ষণ সূত্র' ও 'শক্তির সংরক্ষণ সূত্র'কে একাকার করে দিল। গতিশক্তির পরিবর্তনে যদি ভরের পরিবর্তন হয় তো ঐ দু'টি পৃথক সংরক্ষণ সূত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে ও একটি সূত্রে মিলিত হয়, ভর ও শক্তি পরস্পরের পরিবর্তিত রূপ হয়ে ওঠে। এই ভিত্তিতেই আইন্‌ষ্টাইন্ দেখালেন যে ভর যদি m পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তো E পরিমাণ শক্তি তার থেকে দেখা দেবে—

$$E=mc^2$$

c আলোকের গতি বলে বোঝা গেল যে ১ গ্রাম বস্তু থেকে ৯×১০²⁰ আর্গ শক্তি পাওয়া সম্ভব। আইনষ্টানের এই বিখ্যাত ভর ও শক্তির সম্বন্ধসূত্র পরমাণুর প্রচণ্ডশক্তি অবিষ্কারের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করে দিয়েছিল।

'আন্নালেন ডের ফিজিক' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরেই ম্যাক্স.প্ল্যাঙ্ক আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্বকে', অভিনন্দন জানালেন। ধীরে ধীরে আইনষ্টাইন্ প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি পেতে লাগলেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় এখন তাঁকে অধ্যাপকের পদ দেবার জন্য সাধতে লাগলেন। আইনষ্টাইন্ প্রথমে পেটেন্ট অফিস্ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে জুরিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই য়ুরোপের নানা জায়গা থেকে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান হ'ল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন বার্লিনের বিখ্যাত বিজ্ঞান একাডেমিতে চাকরী নেন। এখানে পড়াতে হ'ত কম ও গবেষণার সময় পাওয়া যেত বেশী। ১৯০৫ থেকেই আইনষ্টাইন্ চিন্তা করছিলেন যে কোন অক্ষপদ্ধতি যদি অন্য অক্ষপদ্ধতির তুলনায় ত্বরণসম্পন্ন হয় তো প্রকৃতির কি কি সত্য উভয় পদ্ধতিতেই অপরিবর্তিত থাক্‌বে? এই সমস্যার সমাধান ছিল অতি দুরূহ। নতুন নতুন গাণিতিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে' ব্যাপক গবেষণা চালান দরকার ছিল। আইনষ্টাইন তাঁর প্রতিভাকে এই কাজেই নিযুক্ত করলেন।

'আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্র' রচনায় আইনষ্টাইন্ নিউটন ও ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের দার্শনিক প্রেক্ষার সাহায্য পেয়েছিলেন, পূর্বসূরী লারমর্ ও লোরেন্‌জের গবেষণার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। তেমনি 'আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ সূত্রে'র গবেষণায়, দুরূহ গাণিতিক সমস্যায় তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ রিসি, লেভি সিভিটা, রীম্যান, মিনকো-ভস্কির কাছ থেকে বিপুল সাহায্য লাভ করেছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইনের অধ্যাপক পোল্যাণ্ডের মিন্‌কোভস্কি দেখালেন যে লোরেন্‌জের অক্ষ-পরিবর্তন ও আইনষ্টাইনের অপেক্ষিকতাবাদেকে এক নতুন রূপে প্রকাশ করা যায়। দেশকে আমরা প্রকাশ করি x, y ও z এই তিন মাত্রা দিয়ে। কালকে আমরা স্বতন্ত্র মাত্রার বলে' মনে করি ; এই কাল সব দেশের মধ্য দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে। মিন্‌কোভস্কি দেখালেন যে দেশ-কালের এই কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা আপেক্ষিকতাবাদ অসম্ভব করে দিয়েছে। সব কিছু নির্দিষ্ট দেশ-কাল মাত্রায় সংঘটিত হয়, দেশমাত্রা থেকে কাল মাত্রাকে আলাদা করে দেখান প্রকৃতিঅনুমোদন করে না। x, y ও z এই তিনটি পরিবর্তনশীল মান ও অঙ্কের সংগে মিনকোভস্কি t বা কালের মান ও অক্ষ যোগ করে আপেক্ষিকতাবাদকে এক নতুন গাণিতিক রূপ দিলেন।

ইউক্লিড তার জ্যামিতি গড়ে তুলেছিলেন সমতল ক্ষেত্রের জন্য। তিনমাত্রার পৃথিবী সমতল নয়, গোলক। তাই গস্‌, লোবাট্‌চেভস্কি, রীম্যান ইত্যাদি গোলক-জ্যামিতি গড়ে তুললেন। দুইমাত্রার ইউক্লিডীয় দেশ তৃতীয় মাত্রার জন্য বক্রতা লাভ করে। আপেক্ষিকতাবাদীরা সেই রকম বল্‌ল যে তিন মাত্রার দেশ, সময়ের চতুর্থমাত্রার জন্য বক্রতা লাভ করে। এই চতুর্মাত্রিক দেশ প্রকৃতপক্ষে আমাদের কল্পনার বাইরে, অপেক্ষিকতাবাদের গণিতেই এর অস্তিত্ব সহজে বোঝা যায়। সেই গাণিতিক অক্ষ-বিশ্লেষণকে প্রকৃতিতে প্রয়োগ করে চতুর্মাত্রিক দেশের ধারণা বোঝাতে গেলে মনুষের মন পেছনে হটে' আসে।

মিন্‌কোভস্কি ও অন্যান্য গণিতজ্ঞদের সহায়তায় আইন্‌ষ্টাইন 'আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্র' থেকে 'আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ সূত্রে'র দিকে অগ্রসর হয়ে চললেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই সাধারণ সূত্র প্রকাশিত হ'ল।

বিশেষ সূত্রের জন্য দু'টি অঙ্গীকার আইনষ্টাইনকে গ্রহণ করতে হয়েছিল—পরমগতি নির্ধারণ অসম্ভব ও অলোর গতি ধ্রুব। সাধারণ সূত্রের জন্য তিনি আর একটিমাত্র অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। এর নাম 'সদৃশতার নীতি' (দি প্রিন্সিপল্ অব ইকুইভেলেন্স)।

—মহাকর্ষ ও ত্বরণ সম্পন্ন গতির ফলাফল সবদিক দিয়েই পরস্পরের সদৃশ। তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য করার কিছুই নেই।

বিশ্বের সকল বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বন্ধ বাক্স যদি কোন ত্বরণগতিসম্পন্ন হয় তো সেই বাক্সের ভেতরকার মানুষ যে পরীক্ষাই করুক না কেন তার মনে হ'বে যে তার বাক্স এক মহাকর্ষ বলের অধীন ও এই বল নিউটনের সূত্র $F=G\,\frac{m_1m_2}{d^2}$ মেনে চলে। একথা সে এইজন্যই ভাববে যে সে তার নিজের গতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। কিন্তু বাক্সের বাইরের যে লোক বাক্সের গতি পায়নি সে জানে যে ব্যাপারটা মহাকর্ষ নয়, ত্বরণ মাত্র। আইনষ্টাইন বললেন যে এই দুই দর্শকের কারো মতকেই আমরা অন্যের মতের চেয়ে শ্রেয়ঃ মনে করতে পারি না। প্রাকৃতিক নিয়ম বিচার করতে বসে উভয়ের মতকেই আমাদের সমান মর্য্যাদা দিতে হ'বে। অর্থাৎ উভয়ের মতকেই পরস্পরের সদৃশ বলে গ্রহণ করতে হ'বে। এই যুক্তিই হল সদৃশতার নীতির ভিত্তি।

মিন্‌কোভস্কির চতুর্মাত্রিক বিশ্বের ধারণা, সদৃশতার নীতি, গোলক-জ্যামিতি ও টেনসর কলনের সাহায্যে আইনষ্টাইন তাঁর জটিল গাণিতিক হিসাবে সমৃদ্ধ আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ সূত্র গড়ে তুললেন।

এই সাধারণ সূত্র যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল তাতে নিউটনের বহু ধারণাই বর্জিত হল। মহাকর্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করারও প্রয়োজন হ'লনা। আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি বা গ্রহগতিসংক্রান্ত ধারণাগুলি

আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ সূত্রপ্রয়োগে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তার একটা মোটামুটি রূপ মাত্র। আপেক্ষিকতাবাদের হিসেব আরো নিখুঁত, সত্যের আরো কাছাকাছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে মহাকর্ষের হিসেব ও আপেক্ষিকতাবাদের হিসেবের মধ্যে অনেকগুলি গড়মিল দেখা দিল, যেমন গ্রহদের কক্ষপথ সংক্রান্ত হিসেব। মহাকর্ষ অনুযায়ী গ্রহের কক্ষপথ হ'বে উপবৃত্তাকার, যদিও অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ফলে কিছু কিছু বিচ্যুতি দেখা দেবে। আইন্‌ষ্টাইনের হিসেব কিন্তু দেখাল যে গ্রহ প্রতিবার একই উপবৃত্তপথে ঘোরেনা। এই উপবৃত্তপথ ক্রমেই আকারে বদলাতে থাকে, তাই রবিনিম্নতা বিন্দু প্রতি বছরই একটু একটু করে সরে যায়। অধিকাংশ গ্রহের উপবৃত্ত প্রায় বৃত্তেরই মত বলে' এই পরিবর্তনের পরিমাণ হয় অতি সামান্য। লা ভেরিয়ে সর্বপ্রথমে বুধের রবিনিম্নতাবিন্দুর ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। সাইমন্ নিউকম্ব্ এই পরিবর্তনের পরিমাণ ভাল করে মেপেছিলেন। এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা এতদিন জ্যোতির্বিজ্ঞান দিতে পারেনি। আপেক্ষিকতাবাদের হিসেবের সঙ্গে কিন্তু নিউকম্বের পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মিল হয়ে গেল।

সাধারণ সূত্র আরও দেখাল যে আলোকরেখা বস্তুর নিকট দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যাবে। এই বক্রতার যে পরিমাণ আইন্‌ষ্টাইন নির্দেশ করলেন তার সঙ্গে নিউটনের আলোক-কণাবাদের ভিত্তিতে করা হিসেবের সঙ্গে মিল হ'লনা। সূর্য্যের কাছ দিয়ে কোন তারকার আলো আসতে গিয়ে বেঁকে যায় কিনা তা কেবলমাত্র পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় পরীক্ষা করে দেখা যায়। আইন্‌ষ্টাইনের সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কেউ এ পরীক্ষা করে দেখেননি। তাই তাঁর ভবিষ্যৎবাণী আপেক্ষিকতাবাদী ও তাদের বিরোধী দু' দলকেই আশা দিল। আপেক্ষিকতাবাদীরা ভাবলেন এই পরীক্ষায় তারা জিতবেন। আর

তাদের বিরোধীরা ভাবলেন যে এইবার আপেক্ষিকতাবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে।

সাধারণ সূত্র একথাও বলল যে বস্তুর নিকটে যে আলোর উৎপত্তি তার বর্ণালী-রেখাগুলি লোহিত প্রান্তের দিকে সরে যাবে, অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিছু বেড়ে যাবে। কতটা বাড়বে তা বস্তুর পরিমাণের ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের হার এত কম যে বহুদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষার সাহায্যে আইনষ্টাইনের হিসেবের সত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে, আইনষ্টাইনের হিসেব প্রকাশের দশ বছর পরে, এভারসেড্ সতর্ক পরীক্ষার সাহায্যে আইনষ্টাইনের মতের সত্যতা প্রমাণ করেন। কিছুদিন পরে অ্যাডামস্ লুব্ধকের কৃষ্ণসঙ্গীর সাহায্যে এই পরীক্ষা চালান। এই লুব্ধকসঙ্গীর ভর খুব বেশী ও ব্যাস কম বলে, আইনষ্টাইন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-পরিবর্তন খুব বেশী হ'ল। অ্যাডামস্ আপেক্ষিকতাবাদের পক্ষে রায় দিলেন।

আলোকরশ্মির বক্রতা দেখার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল। পৃথিবীর কোন কোন স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস দেখতে পাওয়ার কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রেজিলের সোব্রাল ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রিন্সাইপে আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত দু'টি অভিযাত্রী দল পাঠালেন। আইনষ্টাইন জার্মাণীর নাগরিক ছিলেন। যুদ্ধে জার্ম্মাণরা যে ইংরেজদের শত্রু ছিল, বিজ্ঞানীরা কিন্তু তা গ্রাহ্যই করলেন না।

তখন সবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই দু'টি দলকেই বহু অসুবিধা ভোগ করতে হ'ল। ব্রেজিলের আবহাওয়া সূর্য্যগ্রহণের সময় খুব ভালই ছিল। তবু সেখানে নেওয়া আলোকচিত্র, পরীক্ষার জন্য পেতে, কয়েকমাস দেরী হয়েছিল।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন প্রিন্সাইপে গিয়েছিলেন। তিনি আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে

সেদিন ঝড় আর বৃষ্টি। আকাশ সারাদিন মেঘে ঢাকা রইল। বিজ্ঞানীদের মনও আকাশের মত অন্ধকার হয়ে গেল। তবে পূর্ণ-গ্রাসের সময়ে আবছাভাবে সূর্য্য দেখা দিল। একরকম নিরাশ হয়েই বিজ্ঞানীরা আলোকচিত্র তুলতে লাগলেন। তবু আশাপ্রদ ফল তাঁরা পেলেন। সূর্য্যের কাছাকাছি একটি নক্ষত্রের অবস্থান বদলে গেছে দেখা গেল। অর্থাৎ এই নক্ষত্র থেকে আগত আলোকরশ্মি সূর্য্যের ভরের উপস্থিতিতে বক্রতা লাভ করেছে। আইনষ্টাইনের সূত্রে যতটুকু বাঁকার কথা ঠিক ততটুকু বেঁকেছে বলেই দেখা গেল।

ডাইসন ও কাটিংহাম এডিংটনের দলে ছিলেন। ডাইসন কাটিং-হামকে বোঝাচ্ছিলেন যে নক্ষত্রটির আলোর বিক্ষেপ না ঘটতে পারে বা নিউটনের মতানুযায়ী অর্ধবিক্ষেপ ঘট্তে পারে বা আইন্ষ্টাইনের মতানুযায়ী পূর্ণবিক্ষেপ ঘটতে পারে। কাটিংহাম বুঝল যে বিক্ষেপ যত বেশী হ'বে ততই ভাল; তাই ডাইসনকে প্রশ্ন করল যে বিক্ষেপ দু'গুণ হ'লে কি হ'বে? ডাইসন বল্ল—

'তা' হ'লে এডিংটন পাগল হয়ে যাবে ও তোমাকে একাই ঘরে ফিরে যেতে হ'বে।'

সৌভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার ফলে তিন দিন পরেই আপেক্ষিকতাবাদ জয়ী হ'ল, কাটিংহামকে একা ঘরে ফিরতে হ'লনা। ওদিকে আলোক-চিত্রগুলি হাতে পেয়ে বার্লিনে আইন্ষ্টাইন শিশুর মত নাচতে লাগলেন। এক বন্ধু বল্লে—'এবার তা' হ'লে আপেক্ষিকতাবাদের প্রমাণ পেলেন!'

অবাক হয়ে আইন্ষ্টাইন বল্লেন 'প্রমাণ পেলাম? আমার যেন সন্দেহ ছিল।'

ইতিমধ্যে আইন্ষ্টাইনের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। মিলেভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তিনি বিয়ে করলেন বাল্যসঙ্গিনী এল্সাকে। এলসা তখন বিধবা, দু'টি মেয়েও ছিল তার।

আইনষ্টাইনের সমাজতান্ত্রিক মানবিকতাবোধ এতদিনে সুস্পষ্ট আকার নিয়েছিল। লোরেনজ, ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক্, সিগমণ্ড্ ফ্রয়েড্, ইত্যাদি বিজ্ঞানীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুল্লেন। কিন্তু জার্ম্মাণ পুঁজিপতিরা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখল করার জন্য সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে সমরবাদে দীক্ষিত করে তুল্ছিল। শান্তিবাদীদের কণ্ঠস্বর তেমন শক্তিলাভ করলনা। আইনষ্টাইন ভগ্নমনোরথ হয়ে নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ডুবে রইলেন।

যুদ্ধের পরে কোন দেশের লোকই তাঁকে শত্রু মনে করল না। সব দেশ থেকেই তাঁকে সাদর আহ্বান জানান হ'ল। আইনষ্টাইন আগের মতই সরল ও নির্লোভ জীবন যাপন করে চললেন। টাকার লোভে তিনি কখনও পড়লেন না। বেহালা বাজান কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রইল।

হল্যাণ্ডের রাণীর আহ্বানে তিনি একবার হেগ গিয়েছিলেন। রাণীর লোকেরা গাড়ী নিয়ে ষ্টেসনে এসেছিল, কিন্তু চিনতে পারেনি। আইনষ্টাইন একহাতে স্যুট্কেস্ ও অন্য বগলে বেহালা নিয়ে ধূলোবালি ভেঙে গিয়ে রানীর প্রাসাদে হাজির। ঝাক্ড়া ঝাক্ড়া চুল আর বেহালা দেখে রাণী একটু দূর থেকেই চিনতে পেরেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন—'প্রফেসর আইনষ্টাইন, আপনি এতটা হেঁটে এলেন কেন? গাড়ী পাঠিয়েছিলাম যে!'

অমায়িক হাস্যে বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন 'আমার জন্য যে গাড়া পাঠান হ'বে তা তো বুঝিনি। আর পথটুকু হাঁটতে ভারি ভালো লাগল।'

ইংল্যাণ্ডে, লর্ড হ্যাল্ডেনের বাড়ীতে থাকার সময় দেখা গেছে যে চাকর বাকরদের হুকুম করতে তিনি বড় লজ্জা পেতেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ধনীরা পৃথিবী পুনর্বণ্টনের যে স্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু রাশিয়ায়, ১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব জয়ী হয়ে

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা কর্‌ল, সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মিলিত আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিল। দুনিয়ায় পাশাপাশি সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দাঁড়িয়ে রইল।

সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব সব দেশের পুঁজিপতিদের চোখ থেকেই ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসী পুঁজিপতিরা ভাবল যে কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার করতে হ'বে। তারা জার্ম্মাণ একচেটিয়া পুঁজিকে সমরবাদে উৎসাহিত করতে লাগল। দেখা দিল নাজি পার্টি, একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের বীভৎসতম সন্ত্রাসের রাজনৈতিক সংগঠন। তাদের নেতা হ'ল হিট্‌লার। জার্ম্মাণ একচেটিয়া পুঁজির সহায়তায় ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহে ফ্যাসীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

তারা পুঁজিপতিদের যুদ্ধাপরাধ গোপন করে রেখে বল্‌ল যে যুদ্ধের জন্য ও পরাজয়ের জন্য দায়ী ইহুদী ও কম্যুনিষ্টরা। ফ্যাসীবাদী অন্ধ জাতিবিদ্বেষে জার্ম্মাণীর ইহুদী সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে লাগলেন। ইহুদী মন্ত্রী রাথেনাউ খুন হ'লেন। আইন্‌ষ্টাইন প্রমুখ ইহুদী মনীষিদের খুন করার ষড়যন্ত্র হ'তে লাগল। আইন্‌ষ্টাইন অবশ্য এতে ভীত হননি। তিনি ফ্রান্সে, চীনে, জাপানে, সুইডেনে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে ও শান্তির স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়েই তিনি চুম্বক-আকর্ষণ, তড়িৎ-আকর্ষণ, ও মাধ্যাকর্ষণ সব কিছুকে একত্রে বোঝাবার জন্য 'সমন্বিত ক্ষেত্রের মতবাদ', সম্বন্ধে কাজ করছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অপেক্ষিকতাবাদের এই স্বাভাবিক পরিণতি প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে আইন্‌ষ্টাইন বার্লিনে ফিরে এসেছেন।

নাৎসী দল ফুলে ফেঁপে উঠল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত কর্‌ল।

কম্যুনিষ্ট ও ইহুদীদের নিধনযজ্ঞ ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। ইহুদী

বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধেও নানা ষড়যন্ত্র পাকান হ'তে লাগ্‌ল। আইন্‌ষ্টাইনের নামে নানা অপবাদ রটান হ'ল। বলা হ'ল, তিনি রাশিয়ায় গিয়ে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছেন। প্রচার করা হ'ল যে আপেক্ষিকতাবাদ আসলে মার্কস্‌বাদেরই সাফাই।

নাৎসী নেতা গোয়েরিং বল্‌ত—'সংস্কৃতি কথাটা শুনলেই আমার হাত রিভলভারের দিকে এগিয়ে যায়।' গ্যেটে ও সোপেন্‌হরের সঙ্গে আইন্‌ষ্টাইন ও সিগমণ্ড্ ফ্রয়েডের বইয়েরও বহ্ন্যুৎসব কর্‌লে ফ্যাসিষ্টরা।

তখন আইন্‌ষ্টাইন ক্যালিফোর্ণিয়া হয়ে এসে, বেলজিয়ামে গিয়ে লামাইৎর অতিথি হয়ে বাস করছিলেন। নিরাপত্তার জন্য বেলজিয়াম সরকার তাঁর বাড়ীতে সশস্ত্র পাহারা রাখলেন।

জার্ম্মাণীতে আইন্‌ষ্টাইনের বাড়ী 'কম্যুনিষ্টদের অস্ত্রাগার' বলে ফ্যাসিষ্ট সরকার দখল করে নিলেন। আইন্‌ষ্টাইনের মাথার জন্য পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হল। আইন্‌ষ্টাইন্ বুঝলেন যে স্বদেশে ফিরে যেতে আর তিনি পারবেন না। বার্লিন এ্যাকাডেমির সদস্যপদ তিনি ত্যাগ করলেন। আমেরিকার প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তিনি চলে গেলেন। আর একজন জার্ম্মাণ ইহুদী সিগমণ্ড ফ্রয়েড্ আশ্রয় নিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে।

নাৎসীদের দিয়ে ইংরেজ-ফরাসী-মার্কিণ পুঁজিপতিরা যা করাতে চাইছিলেন তা ঘটলনা। বলদর্পিত হিট্‌লার ভার্সাই চুক্তিকে পদদলিত করে য়ুরোপের ওপর দিয়ে তার বিভীষিকাময় যুদ্ধরথ চালাতে লাগলেন। একের পর এক দেশ তার পদানত হ'তে লাগল। ইংল্যাণ্ড নাৎসী বোমার আঘাতে কেঁপে উঠ্‌ল। য়ুরোপের অগণিত পরমাণুবিজ্ঞানী অটো হান, এন্‌রিকো ফার্মি, ওপেন্‌হাইমার, একে একে আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন।

সমগ্র য়ুরোপকে পদানত করে,' হের হেস্‌কে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে

হিট্‌লার সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুনিয়ার ভাগ্য কি হ'বে তা যেন সাময়িকভাবে সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। সোভিয়েটের বীর সন্তানেরা কিন্তু নাৎসী যুদ্ধরথের গতি স্তব্ধ করে দিল। মস্কোতে গিয়ে চা খাওয়া আর হিট্‌লারের হ'লনা, ষ্ট্যালিনগ্রাড. বিজয় স্বপ্নই রয়ে গেল। হিট্‌লারের 'অজেয়' বাহিনী সুনিশ্চিতভাবে পিছু হট্‌তে লাগল।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা এই সময়ে এক সুচতুর রাজনৈতিক চাল চালছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল যুদ্ধে জার্ম্মাণী ও রাশিয়া দুর্বল হয়ে যাবে, আর আমেরিকা ক্ষয় ক্ষতি না ভোগ করে দুনিয়ায় রাজত্ব করার ক্ষমতা লাভ করবে। তাই তারা পরমাণবিক বোমা আবিষ্কার করার কাজে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আইনষ্টাইন, ওপেন্‌হাইমার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যে নাৎসীরা কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত পরমাণবিক বোমা আবিষ্কার করে ফেল্‌বে। তাই আমেরিকার কাছে ঐ বোমা না থাক্‌লে সভ্যতার অস্তিত্বই বিপন্ন হ'বে। আইনষ্টাইন রুজ.ভেল্টের কাছে এ বিষয়ে পত্র দিলেন। তাঁর ও অন্যান্য পরমাণুবিজ্ঞানীদের পরামর্শে ও সাহায্যে পরমাণবিক বোমা তৈরী হ'ল।

কিন্তু আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদী সাধ ও পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। নিতান্তই শক্তি দেখাবার জন্য ও জাপানকে পদানত করার জন্য তারা হিরোসিমো ও নাগাসাকির নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপরে কোন কিছু না বলে পরমাণবিক বোমা নিক্ষেপ কর্‌ল। অথচ তখন জাপানের সামরিক শক্তি চূর্ণ হয়ে গেছে ও জাপানের আত্মসমর্পণ কয়েকদিনের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। (বিখ্যাত ইংরেজ পরমাণুবিজ্ঞানী ব্ল্যাকেটের 'দি মিলিটারি এ্যাণ্ড পলিটিকাল্ কন্‌সিকোয়েনসেজ. অব্ এ্যাটমিক্ এনার্জি' দ্রষ্টব্য)।

তার পরেও সাম্রাজ্যবাদীরা পরমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন

বোমা দিয়ে দুনিয়ার সবাইকে ভয় দেখিয়েছে, সমাজতন্ত্রকে পরাস্ত করার স্বপ্ন দেখেছে। রাশিয়ার পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার অবশ্য পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এ প্রচেষ্টায় কিন্তু আল্বার্ট আইনষ্টাইন কখনও সায় দেননি। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপন মতে দৃঢ় ছিলেন। শান্তির স্বপক্ষে ও মানবিকতার পক্ষে বারবার তাঁর কণ্ঠ শোনা গেছে। পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় মতামত সর্বজনবিদিত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ অন্য সব জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে চায়। তাই তার নিজের ঘরে আজ স্বাধীনতা নেই। 'অমার্কিণ কমিটি' অধুনা লোকান্তরিত ম্যাক্কার্থির নেতৃত্বে সৎ ও স্বাধীনচেতা আমেরিকান নাগরিকদের বহু অন্যায় জেরা করেছে, নানা শাস্তি দিয়েছে, নানাভাবে নির্য্যাতিত করেছে। এখনও এ কাজ থামেনি।

একজন শিক্ষক যখন অমার্কিণ কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের কাছে পরামর্শ চান, তখন তিনি লিখেছিলেন—

'আমার মতে যে কোন নাগরিকের এই কমিটির সামনে উপস্থিত হ'তে অস্বীকার করা উচিত। এজন্য যদি চাক্রী যায়, দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়, কারাগারে যেতে হয়, তবুও আমি তাদের সেই পরামর্শই দেব।'

একদিন যে তিনি রুজভেল্টকে পরমাণবিক বোমা প্রস্তুত করতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন সেজন্য শেষে তাঁর অনুশোচনার সীমা ছিলনা। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে প্রচণ্ড শক্তিকে এইভাবে সমরনায়কদের হাতে তুলে দেওয়া হ'বে জানলে তিনি এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের কাজের কতটা স্বাধীনতা আছে এই সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন—

'কথাটা একটু অন্যভাবে বলি। আমি যদি আবার তরুণ হ'তে পারতাম তো বিজ্ঞানী বা পণ্ডিত বা শিক্ষক হতে চাইতাম না। যেটুকু স্বাধীনতা আজও এ দেশে অবশিষ্ট আছে তা ভোগ করার আশায় আমি বরং মিস্ত্রি কি ফেরিওয়ালা হতাম।'

আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও সমন্বিত ক্ষেত্রের মতবাদের চূড়ান্ত বিচার আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আইন্‌ষ্টাইন নিজেও তাঁর কতগুলি পুরোণো ধারণার সংস্কার সাধন করেছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদ নিঃসন্দেহে নিউটনীয় পদ্ধতির বহু গলদকে দূর করেছে, পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যা দিয়েছে, নতুন নতুন পথে বিজ্ঞানকে চলতে সাহায্য করেছে। তবু আইন্‌ষ্টাইনের মতবাদ ও তার কতগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আজ প্রশ্ন উঠেছে। আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ও অগ্রগতির সূচনা করেছে তার শেষ বিচার না করেও অবশ্য একথা বলা চলে যে এই মতবাদের যিনি স্রষ্টা, মানুষ হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর কোন তুলনা নেই।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আশ্বিন, ৭৬ বছর বয়সে এই মহাবিজ্ঞানী বার্দ্ধক্যজনিত ধমনীকাঠিন্য রোগে প্রিন্সটনের এক হাসপাতালে দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর মৃত্যু যে পৃথিবীর সর্বত্র জনগণমনে গভীর শোকাবেগের সৃষ্টি করেছিল তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিজ্ঞানের একজন দিকপাল হয়েও তিনি সৌন্দর্য্যবোধ, শিল্পবোধ ও মানবিক ন্যায়বোধে আপন চরিত্রকে বিশ্ববন্দিত করে তুলেছিলেন।

টাকা দিয়ে কেউ তাকে কিনতে পারেনি। যা কিছু তিনি আয় করেছেন তার প্রায় সবই গরীবদের দান করে গেছেন। তাঁর নোবেল প্রাইজের পঞ্চাশ হাজার ডলার তিনি বার্লিনের গরীবদের দান করেছিলেন। সেখানকার একশর বেশী পরিবার এক সময়ে তাঁর ওপরে নির্ভর করত। তিনি ট্রামে যাতায়াত করতেন, মোটরগাড়ী ব্যবহার করতে ভালবাসতেন না, রেল গাড়ীতেও তৃতীয় শ্রেণীতে

ছাড়া উঠতেন না। এক মার্কিণ কাগজ তাঁকে লেখার বিনিময়ে অনেক অর্থ দেওয়ার লোভ দেখায়। স্ত্রীর কাছে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন—'আমি কি সিনেমা তারকা যে ওরা আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে অপমান করে গেল।'

মার্কিণ ধনিক পত্রিকাগুলি আইন্‌ষ্টাইনকে 'লাল' আখ্যা দিয়ে নিন্দা করতে কসুর করেনি। তার কারণ এই যে মানবিক অধিকারের স্বপক্ষে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে, শান্তির স্বপক্ষে, ফ্যাসীবাদ, জঙ্গীবাদ ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বারবার কথা বলে উঠেছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি জুলিয়াস্ ও ইথেল্ রোজেনবার্গের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করেছিলেন, ম্যাক্‌কার্থিবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

জীবনে বহুবারই আইন্‌ষ্টাইন সামাজিক সংঘাতের ক্ষেত্র থেকে দূরে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের জটিল সমস্যার মধ্যে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রবল মানবিকতাবোধ বারবারই তাঁকে ন্যায়ের পক্ষে সরব করে তুলেছে। পুঁজিবাদীরা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারটুকুকেই গ্রহণ করে, বিজ্ঞানীর সামাজিক-রাজনৈতিক মতকে কাণাকড়িরও মূল্য দেয়না। যে পরমাণবিক বোমার আবিষ্কার আইন্‌ষ্টাইনের সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া সম্ভব হ'তনা, তার ধ্বংসাত্মক বিভীষিকাময় প্রয়োগ তিনি বহু চেষ্টায়ও বন্ধ করতে পারেননি। জুলিয়াস্ ও ইথেল্ রোজেনবার্গের প্রাণদণ্ড মকুব করতে বলে' তিনি যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাতেও পুজির মালিকেরা কোন কাণ দেয়নি। তাই তাঁর জীবনে এক নৈরাশ্য ও হতাশা এসে দেখা দিয়েছিল। তবু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশ্বের জনসাধারণ যদি শান্তি ও মানবিকতার পতাকাকে নিজ হাতে তুলে ধরে তো বিশ্ব এই দুর্দৈব থেকে রক্ষা পেতে পারে।

যৌবনে তিনি বলেছিলেন—'শুধু নিজে সুখী হ'ব এ চিন্তা নীচ, শুয়োরের বাচ্চার উপযুক্ত।...আমার মতে ধর্ম্মের সার কথা হল এই

যে অন্যের হৃদয়ে হৃদয় মেলাতে হ'বে, তার সুখে আনন্দ করতে হ'বে, তারে দুঃখে বেদনা পেতে হ'বে।'

এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি বলেই বিশ্বজনগণমনে তাঁর এই বিরাট প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই বিশ্বের ইতিহাসে কোন বিজ্ঞানীই তাঁর জীবিতকালে এত সম্মান ও শ্রদ্ধা পাননি। 'জনগণের জন্য বিজ্ঞান' এই কথা বলেছিলেন বলে শুধু আজ নয়, আগামী যুগ ধরে পৃথিবীতে তাঁর পুন্যস্মৃতি অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান আজ এক নতুন যুগসন্ধিক্ষনে এসে উপনীত হয়েছে। আমাদের চোখের সামনে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক যুগের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। ব্যোম্‌ভ্রমণ এখন আর কল্পনার বস্তু নয়।

এই বিপ্লব, অগ্রগতি ও প্রসারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা যেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূবসূরী মহামানবদের অমর কীর্ত্তির কথা স্মরণ করি। আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি যে তাঁদের ধৈর্য্য, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও মনীষার ওপরই আমাদের এই মহাবিজ্ঞানের মহাসৌধ গড়ে উঠেছে। তাঁদের জীবন কাহিনীর আলোচনা আমাদের মনকে অধিকতর সক্রিয় করবে, আমাদের বুকে নতুন বল এনে দেবে, বিজ্ঞানের এই মহাযজ্ঞে আমাদের পক্ষে কর্মীর ভূমিকা নেওয়াকে সহজসাধ্য করে তুলবে।

———